পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ঃ
চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা

সাইদুল হক
এম.ফিল গবেষক
রেজি: নং ১৩৩/৮০-৮১
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রীর শর্ত পূরণের প্রয়োজনে উপস্থাপিত থিসিস

401803

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401803

অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী
অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০০৪

401803

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, **"পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ঃ চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে এই থিসিসটি গবেষকের নিজস্ব গবেষণার ফল।

আরো প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, এই থিসিসটি জমা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তিনি পূরণ করেছেন।

২৬.৪.২০০৪

তারিখ, ঢাকা
এপ্রিল, ২০০৪

অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401803

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলাম এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। আমার গবেষণা কাজ শুরুর অল্প দিনের মধ্যে অধ্যাপক চৌধুরী তার দায়িত্ব পালনের জন্য বিদেশ চলে যান। মূলত অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলামের দিক নির্দেশনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শেই এ গবেষণা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এ গবেষণা কর্মের বিষয় ও শিরোনামের নির্বাচনও তাঁর চিন্তার আলোকেই পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। এ গবেষণায় শ্রদ্ধের দু'জন তত্ত্বাবধায়কের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজ চলাকালে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কামরুল আহ্সান চৌধুরী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় একাডেমীক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

গবেষক বন্ধু আবুল হোসেন এবং সিরাজুল হোসেন গবেষণা কাজে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা পত্রটি অসীম নিষ্ঠার সাথে কম্পিউটারে বিন্যাস করেছেন হুমায়ূন কবীর কাজল।

401803

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৮/৪/২০০৪
(সাইদুল হক)
এপ্রিল, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		
প্রথম অধ্যায়		
	ভূমিকা	১
১.১	পটভূমি	১
১.২	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো	২
১.৩	গবেষণা পর্যালোচনা	২
১.৪	গবেষণার উদ্দশ্যসমূহ	৯
১.৫	গবেষণাপদ্ধতি	১০
১.৬	গবেষণার যৌক্তিকতা	১২
১.৭	পরিধি	১৩
১.৮	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		
ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো ও কার্যাবলী		১৪
২.১	ভূমিকা	১৪
২.২	ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো	১৪
২.৩	ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী	১৫
২.৪	গ্রাম আদালত	১৯
২.৫	গ্রাম আদালতের গঠন, এখতিয়ার ও কার্যপদ্ধতি	২১
২.৬	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও আদেশ বলবৎকরণ	২৪
২.৭	সালিশ	২৬
২.৮	উপসংহার	২৬
তৃতীয় অধ্যায়		
গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ		২৮
৩.১	ভূমিকা	২৮
৩.২	গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন	২৮
৩.২.১	১৮৭০ সালের চৌকিদারি আইন	২৯
৩.২.২	১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার আইন	৩০
৩.২.৩	১৯১৯ সালের গ্রাম স্ব-শাসিত সরকার আইন	৩৪
৩.২.৪	মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯	৪০
৩.২.৫	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭, ১৯৭২	৪০
৩.২.৬	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭৩	৪১
৩.২.৭	স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬	৪১

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৮	স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	৪১
৩.৩	পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ	৪১
৩.৩.১	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩	৪২
৩.৩.২	১৮৮৫ সালের আইন	৪২
৩.৩.৩	এ কে ফজলুল হক এবং ভূমি সংস্কার	৪৩
৩.৩.৪	নুরুন্নবী চৌধুরীর গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্যোগ	৪৪
৩.৩.৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ	৪৫
৩.৩.৬	এন এম খান এবং এইচ এস এম ইসহাকের গ্রাম বিকাশ কর্মসূচি	৪৫
৩.৩.৭	১৯৫০-এর জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন	৪৬
৩.৩.৮	গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি	৪৬
৩.৩.৯	কুমিল্লা মডেল	৫০
৩.৩.১০	বেসরকারি সংস্থা	৫৪
৩.৩.১১	উপসংহার	৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা এলাকা		৫৭
৪.১	ভূমিকা	৫৭
৪.২	গবেষণাধীন বিভিন্ন এলাকার বর্ণনা	৫৭
৪.৩	কুমিল্লা জেলা	৫৭
৪.৪	নেত্রকোনা জেলা	৬১
৪.৫	ঢাকা জেলা	৬৫
৪.৬	উপসংহার	৭০

পঞ্চম অধ্যায়

ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি		৭২
৫.১	ভূমিকা	৭২
৫.২	উপসংহার	৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা		৮০
৬.১	ভূমিকা	৮০
৬.২	ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পদ্ধতি ও চেয়ারম্যান, সদস্যদের ভূমিকা	৮০
৬.৩	পল্লী উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম	৯৬
৬.৪	উপসংহার	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়
ইউনিয়ন পরিষদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ১০৮
৭.১ ভূমিকা ১০৮
৭.২ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ইউপির চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণ ১০৯
৭.৩ উপসংহার ১১২

অষ্টম অধ্যায়
সমীক্ষাভূক্ত চারটি ইউনিয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১১৩
৮.১ ভূমিকা ১১৩
৮.২ বিজয়পুর ১১৩
৮.৩ দক্ষিণ বিশিউড়া ১১৪
৮.৪ সাতারকুল ১১৫
৮.৫ ভুমনী ১১৬
৮.৬ উপসংহার ১১৭

নবম অধ্যায়
উপসংহার ১১৯
গ্রন্থপঞ্জি ১২৩
পরিশিষ্ট-১ ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

স্থানীয় সরকারের ধারণা বাংলাদেশে নতুন কোন বিষয় নয়। বিট্রিশ পূর্ব সময়েও দেশে স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই উপমহাদেশে মোগল, পাঠান আমলসহ বিভিন্ন সময়ে গ্রামগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিভিন্ন সময়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গবেষকরা আত্ন-নির্ভরশীল যে গ্রাম সম্প্রদায়গুলির কথা উল্লেখ করেছেন, সে সমস্ত গ্রাম সম্প্রদায় পরিচালনার ক্ষেত্রে এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

উপমহাদেশে বৃটিশ আগমনের পর ইউরোপীয় ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। সর্বপ্রথম তারা এ দেশের শহরগুলিতে বৃটিশ শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকারের অনুরূপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। বৃটিশ পার্লামেন্ট উপমহাদেশের শহরের স্থানীয় সরকারের জন্য সর্বপ্রথম আইন পাশ করে ১৭৯৩ সালে। আইনটি প্রযোজ্য ছিল তিনটি বড় শহরের জন্য; শহরগুলি হচ্ছে- কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ। অন্যদিকে উপমহাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অগ্রসর হয়েছিল বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এ পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকরা পল্লী এলাকায় একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করে। ১৮৭০ সালে বৃটিশ সরকার গ্রাম এলাকায় চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করে। গ্রামের নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল এই পঞ্চায়েতের।

১৮৮৫ সালের আইন অনুযায়ী বাংলার পল্লী এলাকায় তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। পল্লী এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পানীয়জলের ব্যবস্থা করা এই কমিটির দায়িত্ব ছিল। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসন আমলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালে। এই আইন অনুযায়ী জেলার ডিষ্ট্রিক বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয়। মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়নে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ১৮৮৫ সালের ইউনিয়ন কমিটি বাতিল করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন বড় পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ দ্বারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই আদেশ দ্বারা জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল, থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয় পঞ্চায়েত রাখা হয় এবং ১৯৭৩ সালে আর একবার নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ করা হয়।

১.২ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো

বাংলাদেশে শহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য দু'ধরনের স্থানীয় সরকার রয়েছে। শহরের স্থানীয় সরকারের মধ্যে রয়েছে বড় শহরের জন্য সিটি করপোরেশন ও ছোট শহরের জন্য পৌরসভা।

পল্লী এলাকায় বর্তমানে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে; জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। তবে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নয়। বিভিন্ন জটিলতার কারণে দীর্ঘ সময় জেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

বর্তমানে পুর্ণাঙ্গ স্থানীয় সরকার হিসেবে একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী অঞ্চলে কাজ করছে।

১.৩ গবেষণা পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় শাসন সম্পর্কে কিছু গবেষণা বাংলাদেশে হয়েছে। গবেষনাগুলো পরিচালনা করেছেন মূলত: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এ গবেষণাগুলি কোনটি পরিচালিত হয়েছে মাঠ পর্যায়ে আর কোনটি সেকেন্ডারী উপাত্তের ভিত্তিতে। এ সমস্ত গবেষণা থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে এ গবেষণাগুলো একটা গাইড লাইন দিয়েছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলম, আহাম্মদ সফিকুল হক, এবং খীস্টেন ওয়েস্টার গার্ড, '*Development through Decentralization in Bangladesh. Evidence and Perspective*' (১৯৯৪) গ্রন্থটি ১৯৯০ সালে পরিচালিত একটি গবেষণার ভিত্তিতে রচিত। এই গবেষণায় বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার ৪টি উপজেলায় স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের প্রকৃতি ও পেক্ষাপটে

Dhaka University Institutional Repository

আলোকপাত করা; বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও অক্ষমতা যাচাই করা।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের তাত্ত্বিক দিক বাংলাদেশের বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের গঠন ও দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে আলোচিত হয় উপজেলা পরিষদের আয় ব্যয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ছোট গ্রুপ বা দল ভিত্তি করে যে সমস্ত সংগঠন কাজ করছে তাদের বিষয় (যেমন বি.আর.ডি.বি, গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন এন.জি.ও)।

এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথার্থভাবে কাজ করছে না। স্থানীয় সরকার হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কতে পারছে না। এর অন্যতম কারণ ইউনিয়ন পরিষদের লোকবলের অভাব। ইউনিয়ন পরিষদ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রেই তার ভূমিকা সীমিত রাখে। এ গবেষণায় বলা হয়, কার্যকরি স্থানীয় সরকার করতে হলে স্থানীয় সরকারকে আরো অংশগ্রহণমূলক এবং স্বায়ত্বশাসিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

তোফায়েল আহমেদ, *একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন : কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব* (২০০২) একটি গবেষণা গ্রন্থ; এই গবেষণা গ্রন্থে ড. তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের স্বরূপ অনুসন্ধান ও মাঠ প্রশাসনের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থের শুরুতে লেখক বলেন, নতুন শতাব্দী বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন, পরিবর্তন ও প্রতিযোগিতার শতাব্দী। এ শতাব্দীতে পিছিয়ে পড়লে ভবিষ্যতের সংকট আরো গভীর হবে। তার মতে এ সময় রাষ্ট্রপরিচালনা করা একটি অতি দ্রুত যানবাহন চালনার মত ঝুঁকিপূর্ণ আর আমাদের দেশের বর্তমান প্রশাসন একটা প্রায় বিকল অবস্থায় আছে। অচল ও বিকল যন্ত্র দিয়ে সচল প্রশাসন চালানো কঠিন। তাই যথাশিঘ্রই সম্ভব সে অচল ও বিকল ব্যবস্থাকে সচল ও গতিশীল করতে হবে, দেশ শাসনের সকল দায়িত্ব সরকারের কাছে ধরে না রেখে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া এবং দেশের সকল মানুষকে ক্ষমতাবান ও শাসনকার্যে অংশীদার করা প্রশাসন ও উন্নয়নকে গতি সঞ্চারের অন্যতম প্রধান একটি উপায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের অবস্থা নির্ণয় ও এগুলি সংস্কারের কতগুলি পথ প্রদর্শন করা। গবেষক বলেন, সংস্কারের কিছু ঝুঁকি ও পাশ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কার এড়িয়ে যাবার দায় ও ঝুঁকি অনেক বেশি বেদনাদায়ক।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কতিপয় প্রস্তাবনা করতে গিয়ে বলা হয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবা কর্মসমূহকে ব্যয় সাশ্রয়ী, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার উপায় হচ্ছে সরকারের সেবাদান ও উন্নয়ন কর্মপরিচালনায় নিয়োজিত সংগঠন ও এজেন্সীগুলির বিকেন্দ্রীকরণ।

বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অঙ্গীকার এবং সে অঙ্গীকার পাওয়া গেলে গবেষক নিম্নলিখিত নীতিমালা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

১। জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিচের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ে শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি।

২। যে সব দায় দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে সে একই বিষয়ে কাজ করা থেকে পূর্বে কর্মরত সরকারী দপ্তর, এজেন্সী বা সংগঠনকে বিরত করা।

৩। মাঠ প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করে প্রতি কাঠামোর মুখ্য সমন্বয় বা প্রশাসক নিয়োগ প্রতিটি স্তরের কার্য পরিধি নির্ধারণ করে দায়িত্বের সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন।

এ গবেষণা গ্রন্থে জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু দেশের সংবিধানে বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ পৃথক করার নির্দেশ আছে তাই সে আলোকে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হবে। জেলা পর্যায়ে পুলিশ বিভাগের কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন ও পুলিশ প্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তনের দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। তাছাড়া শক্তিশালী জেলা পরিষদ সৃষ্টি করে সে আলোকে জেলা প্রশাসনের পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়।

এ গবেষণায় উপজেলা পর্যায়েও পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদী সংস্কারের অংশ হিসাবে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে জেলা পরিষদ বা জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বা পরিকল্পনা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব, এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পর্যায়ে কতগুলি সুনির্দিষ্ট সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়, এর মধ্যে আছে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে দেয়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর তালিকা সংশোধন করে কার্য পরিধি কমিয়ে আটটি কাজ ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনা, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এবং এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার ক্ষমতা/কর্তৃত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা।

পরিশেষে মন্তব্য করা হয়, সেবাধর্মী, শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার পেতে হলে রাজনীতি ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ, সেবা, সহনশীল ও সংবেদনশীল সংস্কৃতির চর্চা দরকার।

কামাল সিদ্দিকী, *Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challenges* (২০০০) গ্রন্থটি স্থানীয় সরকারের সংস্কার সংক্রান্ত ২৫টি নিবন্ধ নিয়ে সংকলিত। নিবন্ধগুলি মূলত সেকেণ্ডারী সোর্সের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। নিবন্ধগুলিতে স্থানীয় পর্যায়ের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে, স্থানীয় প্রশাসন, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সমাজ। গ্রন্থের সবগুলি নিবন্ধের একই উদ্দেশ্য; স্থানীয় সরকারের বর্তমান সমস্যাগুলি আলোচনা এবং এর সমাধান প্রদান করা। কোন কোন নিবন্ধে কেন্দ্র ও স্থানীয় সম্পর্ক গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত যেমন, (১) বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন, একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, (২) স্থানীয় শাসন সংস্কার, (৩) স্থানীয় প্রশাসন সংস্কার, (৪) সিভিল সমাজের সংস্কার এবং (৫) বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন সম্পর্কে পরিশেষের মন্তব্য।

গবেষক, গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় সরকারের স্তর বিষয়ে যে বিতর্ক আছে তা তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ এলাকায় যদি স্থানীয় সরকারের অনেকগুলি স্তর সৃষ্টি করা হয় তবে কাজের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এতগুলি স্থানীয় সরকার স্তরকে অনুদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের মাত্র একটি স্তর হলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শূন্যতা দেখা দেবে। এই কারণে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের স্তর নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল উপাদান বিবেচনা করে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনায় অতীতে বিভিন্ন সময় গ্রামীণ এলাকায় কয় স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ছিল সেটা পর্যালোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকী এ গ্রন্থে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরেন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের স্থান সরকারি কর্মকর্তাদের নিম্নে। কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে থাকেন। এ অবস্থার পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকারের জন প্রতিনিধিদের মর্যাদা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থায়ী কমিশন থাকা আবশ্যক।

গবেষণা গ্রন্থে উপজেলা পরিষদকে বাতিল করাকে বড় ভ্রান্তি বলে উল্লেখ করা হয় এবং বিকেন্দ্রীকরনের জন্য উপজেলা পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বড় শহরগুলির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাগুলির কার্যকলাপের যথার্থ সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের সংস্কারের ক্ষেত্রে গবেষক বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্যার আলোকে কতগুলি সুপারিশ রাখেন। এগুলির মধ্যে আছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সকল ক্যাডারের যুগ্ম সচিব ও সিনিয়র উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়ে মেধার ভিত্তিতে একটি পুল গঠন করা এবং এই পুল থেকে জেলার ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করা। এ ছাড়া পুলিশসহ জেলার সকল বিভাগের কাজ সমন্বয়ের দায়িত্বে ডেপুটি কমিশনারকে প্রদান করা।

এ গবেষণায় শাসনের ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সমস্ত সিভিল সমাজের মধ্যে আছে বেসরকারি সংস্থা, ঢাকা শহরে সংগঠিত থানা ও জেলা সমিতিসমূহ, সমবায়, হাট বাজার সমিতি, স্থানীয় বিচার/সালিশ ইত্যাদি। গবেষক এই সব সিভিল সমাজের সামাজিক মূলধনসহ (Social capital) বিভিন্ন শক্তির দিকগুলি চিহ্নিত করেন।

পরিশেষে গবেষণা গ্রন্থের উপসংহারে বলা হয় সিভিল সমাজ, উদার রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সংবাদ মাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ কৃষক সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর ঐক্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় অবদান রাখতে পারে।

কামাল সিদ্দিকী, *Local Government in Bangladesh* (১৯৯৪) বইটি একটি গবেষণা এবং টেক্সট হিসাবে রচিত। কামাল সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত ২য় সংস্করণের বইটি নয়টি অধ্যায়সহ ৩৬৭ পৃষ্ঠার। বইটিতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার এর সংজ্ঞা, স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা, এর দূর্বল অবস্থান এবং সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা এবং মার্ক্সীয় দর্শনে স্থানীয় সরকারের রূপরেখা এ বইতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃটিশ পূর্ব ভারত এবং বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমলসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। এই উপমহাদেশেল স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে বইটিতে উল্লেখ করা হয়। বৃটিশ আগমনের আগেও এদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। বৃটিশ আগমনের পর তারা এদেশে ইউরোপীয় ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করে। বৃটিশরা এদেশে সর্ব প্রথম কতগুলি বাণিজ্য কেন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপন করে। সে কারণে তারা প্রথম এদেশে শহরের স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করে। ১৭৯৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আইন পাশ করে। পরবর্তীকালে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর স্থানীয় সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, নগর স্থানীয় সরকারের অধ্যাদেশ এবং অধ্যাদেশে সরকারের ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে বইটিতে গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকারের সকল কার্যাবলী, কমিটিসমূহ, কমিটির কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বইটিতে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। স্থানীয় সরকারের অর্থ ব্যবস্থা এর তত্ত্ব দিয়ে শুরু করে অর্থ ব্যবস্থার পটভূমি অর্থাৎ বৃটিশ শাসন আমল থেকে বাংলাদেশের আমলের আশির দশক পর্যন্ত অর্থ ব্যবস্থাব স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ ব্যবস্থা আলোচনাকালে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের আয় ব্যয়ের ধরন, স্তর ভিত্তিক খাত বিন্যাস করে আয় ও ব্যয় সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি অনুদান নির্ভর। কর ব্যবস্থাপনা ও বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

বইটির শেষভাগে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সমস্যা ও ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় সরকারের কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রায় ৪৫টি ইস্যু উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন স্থানীয় সরকারের ধারণা এবং বাংলাদেশে এর অপরিহার্যতা, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনৈতিক নীতিমালা, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের ভূমিকা, স্থানীয় সরকারের স্তর বিন্যাস, স্তর বিন্যাসে মূল কেন্দ্র বা জ্যোতি কেন্দ্রের অবস্থান, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা, নির্বাচনী ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব, জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উপযোগিতা অনুপযোগিতা উদাহরণ এবং কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

'লোকাল গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বইটি স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ।

হোসেন জিল্লুর রহমান, এস. আমিনুল ইসলাম, *Local Governance and Community Capacity. Search for new Frountiers*, (২০০২) গ্রন্থটি স্থানীয় শাসন বিষয়ে একটি গবেষণা। গবেষণা গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্থানীয় শাসন বিষয়ে সম্প্রদানগুলির (Community) সক্ষমতা যাচাই করা এবং এ বিষয়ে নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান করা। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে শাসন এবং সংগঠনের প্রশ্ন, অনানুষ্ঠানিক প্রত্যয়নগত অনুসন্ধান, সম্প্রদায় ও প্রেক্ষাপট, গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের উপর গবেষণার পর্যালোচনা। শাসনের ক্ষেত্রে গবেষণায় পদ্ধতিগত আলোচনা সম্প্রদায়ের ক্ষমতাগুলি চিহ্নিত করা। শালিসের পর্যালোচনা এবং স্থানীয় শাসনকে একটি রাজনৈতিক এজেণ্ডা হিসেবে আলোচনা করা হয়। গবেষক ইসলাম অনানুষ্ঠানিক শাসনের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া সামাজিক পেক্ষাপটে সম্প্রদায় ও বাংলাদেশে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন গবেষণা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

গবেষক রহমান সম্প্রদায়ের শক্তিগুলি চিহ্নিত করা এবং শালিস বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। গবেষণার ফলাফলে গবেষকরা বলেন, সুশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র অপসারণ করে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে এবং তারা এক্ষেত্রে একটা দ্বিমুখী কৌশল সুপারিশ করেন। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস এবং স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ।

মোহাম্মদ আবদুল আজীজ, The Union Parishad in Bangladesh; An analysis of Problems and Diections of Reform (১৯৯১) এ গবেষণা গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ এবং সংস্কারের দিক নির্দেশনা দেওয়া। গবেষক এ গ্রন্থে ইউনিয়ন পরিষদের পটভূমি, গঠন ও কাঠামো,

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলী, গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে সংস্কারের কতগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। এ সংস্কার প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ করার ক্ষমতা বিচার করে তাকে কার্যাবলী অর্পন করা; অর্থনৈতিক কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উন্নয়ন, গ্রাম আদালতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গ্রন্থটিতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী, কার্য পদ্ধতির একটা চিত্র পাওয়া যায়। সে সাথে গবেষক গ্রন্থে সমস্যবলীও চিহ্নিত করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত সার

গবেষণা পর্যালোচনাগুলো থেকে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সামান্য। আরো লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত; সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে প্রশাসনিক সমস্যা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা, কর ব্যবস্থাপনার সমস্যা। অন্যদিকে আছে স্থানীয় সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রতিকূলতা; আমলাতন্ত্রের প্রভাব, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা গ্রন্থগুলো বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসনকে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। গবেষণাগুলোতে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকারের শক্তি হিসেবে সামাজিক মূল্যবোধ এবং স্থানীয় সংস্থা, সমিতি, সিভিল সমাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাগুলোতে ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বিষয়ে গবেষণাগুলোতে আলোকপাত করা হয়নি। বর্তমান গবেষণাটি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কি ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধান করেছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

১। গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন করা। স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ের স্তর হিসেবে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ব্যাপক। বাস্তবে তার স্বরূপ কি তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী উন্নয়নে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু বাধাগুলোর বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের এ বাধাগুলো চিহ্নিত করা এ গবেষণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

৩। পল্লী অঞ্চলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণার তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায়সহ পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

৪। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন বাধার কারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ গবেষণার চতুর্থ উদ্দেশ্য ইউনিয়ন পরিষদকে এক্ষেত্রে আরো কার্যকরি করতে হলে এ সমস্ত বাধাগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায়সমূহ তৃণমূল পর্যায় থেকে জানা।

১.৫ গবেষণাপদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটির জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির উপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। আর গুণগত তথ্যের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে চারটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। এছাড়া এই চারটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়।

ইনস্ট্রুমেন্ট (Instruments)

পরিমানগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪৮টি প্রশ্ন সম্বলিত ১০ পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। এ প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান সদস্যরা কি ভূমিকা পালন করে এবং পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কি ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এলাকা

এ সমীক্ষায় যে চারটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে, নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ ও ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের সাতারকূল ও ভুমনী ইউনিয়ন পরিষদ। এ চারটি ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হয়েছে কতগুলি বৈশিষ্টের দিকে লক্ষ্য রেখে। বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়নের বৈশিষ্টগুলি যাতে সমীক্ষায় প্রতিফলিত হয় সে কারণে সমীক্ষার অধীনের চারটি ইউনিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলির ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

সমীক্ষার অধীনের কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার বিজয়পুর একটি উন্নত ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল, কুমিল্লা শহরের সাথে এ ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের পাঁকা রাস্তার মাধ্যমে সংযোগ রয়েছে। যেহেতু বিজয়পুর ইউনিয়নটি কুমিল্লা সদর উপজেলায় অবস্থিত সে কারণে এ ইউনিয়নটি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কুমিল্লায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (বার্ড) গবেষণাগার হিসাবে কোতয়ালী থানা বা সদর উপজেলা ১৯৫৯ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সে কারণে দু'স্তর বিশিষ্ট সমবায়সহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা কর্মসূচি এ ইউনিয়নে হয়েছে। বার্ডের গবেষণাগার হিসেবে থাকার কারণে কৃষির বৈপ্লবিক পরিবর্তনসহ বহু ক্ষেত্রে এ ইউনিয়নটির উন্নতি হয়েছে। সুতরাং একটি উন্নত ইউনিয়ন হিসাবে বিজয়পুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে এ সমীক্ষায়।

অন্যদিকে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া একটি অনুন্নত ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নটির সাথে উপজেলা সদর তথা জেলা সদরের যোগাযোগ খুবই খারাপ। প্রায় ১২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে উপজেলা সদর থেকে এ ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে যেতে হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এ ইউনিয়নটির অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। এ ইউনিয়নে দিন মজুরের সংখ্যা অনেক এবং তাদের দৈনিক মজুরি দেশের অনেক অঞ্চল থেকে তুলনামূলকভাবে কম। এখানে দিন মজুরের মজুরি ৫০ টাকার বেশি নয়। বর্তমান সময়ে নেত্রকোনা সদরের সংসদ সদস্য সরকার দলের নয় এবং সে কারণে দক্ষিণ বিশিউড়াসহ সদরের অন্যান্য ইউনিয়ন সরকারের বিশেষ কোন আনুকুল্য পাচ্ছে না। এ সমস্ত বিচার করে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে দক্ষিণ বিশিউড়াকে একটি পশ্চৎপদ ও অনুন্নত ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবে চিহ্নিত করে এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাতারকুল ইউনিয়ন পরিষদ ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন পরিষদ। তেজগাঁওই বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র সার্কেল এবং এই সার্কেলের দায়িত্বে একজন সার্কেল অফিসার কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশের অন্য জায়গায় পূর্বের থানা পরিষদের স্থানে উপজেলা পরিষদগুলি প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে কাজ করছে এবং সার্কেল অফিসারের পরিবর্তে সে সব স্থানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্মরত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন। সাতারকূল ইউনিয়নটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান একজন মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্গত। সে কারণে মন্ত্রী মহোদয় সাতারকূলের উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহী। একজন মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত একটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব রাখার জন্য এ নিরীক্ষায় সাতারকূল ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ডুমনী তেজগাঁও সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত এমন একটি ইউনিয়ন যে ইউনিয়নটি সম্প্রতি অন্য একটি ইউনিয়নের অংশ বিশেষ কেটে নতুন ইউনিয়ন হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ডুমনী আগে বেরাইদ ইউনিয়নের অংশ ছিল। ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদের এখন পর্যন্ত কোন অফিস বিল্ডিং তৈরি করা হয়নি। তথ্য সংগ্রহ করার সময় ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদে কোন সচিব কর্মরত ছিল না। ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ বেশিরভাগ সদস্য প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। স্বল্প অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত একটি নতুন ইউনিয়ন পরিষদকে এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডুমনী ইউনিয়নকে এ গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে।

এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে উন্নত বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ, অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ, মন্ত্রী প্রভাবিত সাতারকূল এবং অনভিজ্ঞ নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত নতুন ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদের উপর।

উত্তরদাতা

এ চারটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে ১৬ জন করে উত্তরদাতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং ৪ জন ওয়ার্ড সদস্য, মোট ৬ জন আর ইউনিয়নের সমাজ নেতাদের মধ্য থেকে ১০ জন, সর্বমোট ১৬ জন উত্তরদাতা। সমাজনেতা উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যসহ গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, মাতবর, সর্দার। চারটি ইউনিয়ন মিলিয়ে উত্তরদাতাদের সংখ্যা ৬৪ জন। এসব উত্তরদাতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা

বিভিন্ন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের উপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছে কিন্তু পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ প্রকৃত পক্ষে কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে সে বিষয়ে খুব কম গবেষণা রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এ সমীক্ষাটি এ বিষয়ে একটি ছোট উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ পরিধি (Scope)

বর্তমান গবেষণাটি ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ অধ্যায়গুলো হচ্ছে (১) ভূমিকা, (২) ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো ও কার্যাবলী, (৩) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন, (৪) গবেষণা এলাকা, (৫) ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি, (৬) পল্লী উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ, (৭) ইউনিয়ন পরিষদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, (৮) সমীক্ষাভুক্ত চারটি ইউনিয়ন পরিষদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও (৯) উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকার পর এ গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের ধারা উল্লেখিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। সমীক্ষার চারটি ইউনিয়ন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে আর নবম অধ্যায়ে উপসংহার।

১.৮ গবেষণায় সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণাটির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বিষয়টি অনেক ব্যাপক। কেবলমাত্র চারটি ইউনিয়ন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এমন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসা অত্যন্ত কঠিন। এ ধরনের একটি বড় বিষয়ের জন্য সারাদেশ থেকে আরো অনেক বেশি উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ গবেষণা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরো বড় কোন গবেষণায় বর্তমান গবেষণাটি থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো ও কার্যাবলী

২.১ ভূমিকা

তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ পল্লীর মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ সম্পাদন করে থাকে। এ অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় ও কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের বিচারের ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ১৯৭৬। এ অধ্যায়ে অধ্যাদেশ দু'টির আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, কার্যাবলী, বিচারের ক্ষমতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলির বাইরে ইউনিয়ন পরিষদ কিছু অনির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে সে সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়।

২.২ ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে, ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ দ্বারা[১]। এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জনসেবা ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মপরিধি বিশাল। এ দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে পালন করতে পারলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্বগুলি পালনে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর ১৯৯৭ সালের সংশোধনী অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয়জন সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য সমন্বয়ে। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা তিনটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। সমগ্র ইউনিয়নের ভোটারদের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড/ওয়ার্ডসমূহের ভোটারদের দ্বারা (প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে) নির্বাচিত হন।

---

[১] The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983, Government Printing Press, Dhaka, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। তথাপি নবনির্বাচিত পরিষদ তাদের প্রথম সভা না করা পর্যন্ত পুরাতন পরিষদ কাজ চালিয়ে যায়। নবনির্বাচিত পরিষদ তাদের নাম অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই তাদের সভা অনুষ্ঠিত করবে।

ইউনিয়ন পরিষদে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন, যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন, তাঁর বয়স যদি কমপক্ষে ২৫ বছর হয় এবং চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে আর সংরক্ষিত আসনের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ থাকে। কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য অযোগ্য হবেন, যদি তিনি: (ক) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হয়ে থাকেন, (খ) দেশের আইন অনুযায়ী দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয়ে থাকেন, (গ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়ে থাকেন, (ঘ) তিনি নৈতিক অপরাধজনিত ফৌজদারী মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে আনধিক দু'বছরের কারাদন্ড পেয়ে থাকেন এবং তার কারামুক্তির পর ৫ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে, (ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা ইউনিয়ন পরিষদের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে অর্থের বিনিময়ে সার্বক্ষনিক চাকুরিতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, অথবা ইউনিয়ন পরিষদের কোন কাজের জন্য বা কোন মালামাল সরবরাহের জন্য বা কোনভাবে জড়িত থাকেন, (চ) কোন সরকারি ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বরখেলাপ করে থাকেন, (ছ) ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর, রেট, ফি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, (জ) সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরি থেকে নৈতিক কারণে অপসারিত হয়ে থাকেন এবং অপসারণের তারিখ থেকে যদি ৫ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে।

২.৩ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদকে যে কার্যাবলী প্রদান করা হয়েছে, সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; বাধ্যতামূলক কার্যাবলী এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী। বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর সংখ্যা মোট ১০টি এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলীর সংখ্যা মোট ৩৮টি।

বাধ্যতামূলক কার্যাবলী

(১) আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে প্রশাসনকে সহায়তা দান সংক্রান্ত;

Dhaka University Institutional Repository

(২) অপরাধমূলক সকল কার্যকলাপ, বিশৃংখলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে যা করা প্রয়োজন;

(৪) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(৫) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার;

(৬) সরকারি সম্পত্তি যেমন- সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ;

(৭) ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্ম-তৎপরতা পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন;

(৮) সেনিটারী পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

(৯) জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য রেকর্ডভুক্তকরণ;

(১০) সকল প্রকারের শুমারী পরিচালনার দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও ইউ.পি নিম্নোক্ত দু'টো দায়িত্ব পালন করে থাকে-

ক. সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দায়িত্ব;

খ. সময়কালে প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

ঐচ্ছিক কার্যাবলী

(১) জনপথ ও রাজপথের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(২) সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো;

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সাধারণভাবে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ, বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;

(৫) কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা;

(৬) পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ;

(৭) জনপথ, রাজপথ, সরকারি স্থান নিয়ন্ত্রণ ও অনধিকার প্রবেশ রোধকরণ;

(৮) জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে উৎপাত ও তার কারণ বন্ধকরণ;

(৯) ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী, বন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(১১) অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকরণ;

(১২) মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

(১৩) পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ;

(১৪) ইউনিয়নের দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ;

(১৫) বিপজ্জনক দালান ও সৌধ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ;

(১৬) কুয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য কাজের ব্যবস্থাকরণ ও সংরক্ষণ;

(১৭) খাবার পানির উৎস দূষিতকরণ রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ;

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশুর গোসল নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

(২০) পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ;

(২১) আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ;

(২২) আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ;

(২৩) আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ;

(২৪) গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য পশু বিক্রয়ে ইচ্ছুক তালিকা প্রণয়ন;

(২৫) মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন;

(২৬) জনসাধারণের উৎসব পালন;

(২৭) অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতার ব্যবস্থাকরণ;

(২৮) বিধবা, এতিম, গরিব এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যকরণ;

(২৯) খেলাধূলার উন্নতি সাধন;

(৩০) শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন ও উৎসাহ দান;

(৩১) বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩২) পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ;

(৩৩) গবাদি পশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(৩৪) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ;

(৩৫) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থাকরণ;

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬) ইউনিয়ন পরিষদের মত সুদৃশ্য কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ;

(৩৭) জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্যকরণ;

(৩৮) ইউনিয়নের বাসিন্দাদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

অনির্ধারিত কার্যাবলী

অধ্যাদেশে বর্ণিত বিভিন্ন কাজসমূহ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকে, এগুলো হলো ঃ

১. নাগরিকত্বের সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র, উত্তরাধিকারী সনদপত্র, গরু/ছাগল বিক্রয়ের প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি;

২. রেশন কার্ড প্রদান;

৩. ভিলার নিয়োগ;

৪. ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সনাক্তকরণ; এবং

৫. উপজেলা বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধার জন্য রোগী প্রেরণ ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।

২.৪ ঃ গ্রাম আদালত

বৃটিশদের আগমনের পূর্বে এদেশে পঞ্চায়েত নামে যে সংস্থা প্রচলিত ছিল তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য সম্পাদন ও ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা। বৃটিশরা যদিও প্রথমে এই দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপর অর্পণ করেনি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ১৯১৯ সালের পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার বিচার করার এখতিয়ার দেয়া হয়।

আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণেই অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এই দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘদিন মামলা-মোকদ্দমা চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে যদি ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ও মামলা-মোকদ্দমা নিস্পত্তির ব্যবস্থা থাকে তা হলে তারা অনেক বিড়ম্বনা ও খরচের হাত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহতি লাভ করতে পারে। দ্রুত বিচার কার্যের ফলে ঝগড়া-বিবাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বহুলাংশে কমে যায় এবং তা গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কয়েক বছর যদিও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সংস্থাগুলির বিচারকার্য করার কোন ক্ষমতা ছিল না কিন্তু গ্রাম আদালত অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬[১]-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে পুনরায় বিভিন্ন ধরনের বিচার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিচার নিষ্পত্তিমূলক ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যেই এই আদালতের প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা

ক. ফৌজদারী ঃ

১. বেআইনী জনতার সদস্য হওয়া এবং রায়টিং (বেআইনী জনতার সদস্য সংখ্যা ১০ বা তার কমে হলে) (ধারা ১৪৩ দঃ বিঃ এবং ১৪৭ দঃ বিঃ)।

২. সাধারণ আঘাত, ক্ষতিকারক দুষ্কর্ম (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ৫০০০/- টাকা বা তার কম হলে) এবং ফৌজদারী অনধিকার প্রবেশ (ধারা ৩১২/৪২৭ ও ৪৪৭ দঃ বিঃ)।

৩. খোলা জায়গায় হাতাহাতি, প্ররোচিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কাহাকেও আঘাত করা, বেআইনী অবরোধ, বেআইনী বাধাদান, বিনা প্ররোচনায় অবৈধ শক্তি প্রয়োগ, প্ররোচিত হলে অবৈধ শক্তি প্রয়োগ। শান্তি ভঙ্গযোগ্য অপমানজনক কার্যাবলী, অবৈধ ভয়ভীতি প্রদর্শন, ঐশীভীতি প্রদর্শনমূলক কার্য, কোন শব্দ বা ইংগিতের মাধ্যমে নারীর শ্লীলতাহানীকরণ এবং মাদকাসক্ত অবস্থায় মাতলামি এবং কাহারো বিরক্তি উৎপাদন। (ধারা- ১৬০, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৮, ৫০৪, ৫০৬ (১ম ভাগ), ৫০৮, ৫০৯, এবং ৫১০ দঃ বিঃ)।

৪. গরু চুরি এবং অন্যান্য সকল চুরি যদি চুরিকৃত মালের মূল্য ৫০০০/- টাকা বা তার কম হয়। (ধারা ৩৭৯, ৩৮০ এবং ৩৮৯ দঃ বিঃ)।

[১] Village Court Ordinance, 1976, Government Printing Press, Dhaka, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

৫. অস্থাবর সম্পদ আত্মসাৎ বা নিজের প্রয়োজনে সেগুলির পরিবর্তন সাধান, অবৈধ বিশ্বাস ভঙ্গ প্রতারণা ও প্রতারণামূলকভাবে সম্পতি হস্তান্তর এবং যে কোন মূল্যবান দলিলাদির ধ্বংশ সাধন (যদি ঐ সম্পদের মূল্য ৫০০০/- টাকার অধিক না হয়। (ধারা ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭ ও ৪২০ দঃ বিঃ)।

গ. দেওয়ানী

১.ক্তচুক্তিবদ্ধ টাকা আদায়ের মামলা।

২. অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার বা তার মূল্য আদায়ের মামলা।

৩. দখল হারানোর এক বছর সময়ের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি দখল উদ্ধার সংক্রান্ত মামলা।

৪. অবৈধভাবে গৃহীত বা ধ্বংসকৃত অস্থায়ী জিনিস পত্রে ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত মামলা।

৫. গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশের জন্য খেসারতের মামলা। (উপরোল্লিখিত মামলাসমূহের যখন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য মান ৫০০০/- টাকা ও তার কম হবে)।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত বিচার করতে পারবে না ঃ

ক. ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্বে অন্য কোন আদালত কর্তৃক কোন আদালত গ্রাহ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

খ. দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে

১. যখন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্বার্থ জড়িত থাকে।

২. বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান কলহের ব্যাপারে কোন সালিশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে।

৩. মামলায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কার্যরত কোন সরকারি কর্মচারি পক্ষ হয়ে থাকলে।

২.৫ গ্রাম আদালতের গঠন, এখতিয়ার ও কার্যপদ্ধতি

একজন চেয়ারম্যান এবং বিবাদের প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্য নিয়ে মোট ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্যের একজন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন তবে যদি চেয়ারম্যান কোন কারণ বশতঃ তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, কিংবা তাঁর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপত্তি ওঠে তা হলে পরিষদের অন্য কোন সদস্য আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ সদস্য মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হন তবে উক্ত মনোনয়ন ছাড়াই উক্ত আদালত বৈধভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি কোন পক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্যকে পক্ষপাতিত্বের কারণে মনোনীত করতে না পারেন তা হলে চেয়ারম্যানকে অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করা যাবে।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

ক. যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা যেখানে অপরাধের কারণের উদ্ভব হয়েছে সেই ইউনিয়নের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে গ্রাম আদালত সীমাবদ্ধ থাকবে।

খ. যখন কোন অপরাধ এক ইউনিয়নে সংঘটিত হয়েছে কিন্তু অপরাধকারীগণ অন্য ইউনিয়নের বাসিন্দা তখন যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় তাদের স্ব স্ব ইউনিয়ন হতে সদস্য মনোনয়ন দিতে পারবেন।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

ক. গ্রাম আদালত অবমাননা বা সমন অস্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে জরিমানা বা জরিমানা অনাদায়ে জেল প্রদান করতে পারবেন না। কিন্তু বিচারযোগ্য ফৌজদারী অপরাধসমূহের বিচারে কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে আদালত দোষী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণদানের আদেশ দিতে পারেন। তবে ক্ষতিপূরণ কোনভাবেই ৫০০০/- টাকার উর্দ্ধে হবে না।

খ. দেওয়ানী মামলায় গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ অথবা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা তার দখল প্রত্যর্পন করার আদেশ দিতে পারেন।

কার্য পদ্ধতি

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে বিবাদের যে কোন পক্ষ বিচার চেয়ে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট ৪.০০ টাকা (দেওয়ানী মামলা হলে) অথবা ২.০০ টাকা (ফৌজদারী মামলা হলে) ফি দিয়ে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিবরণাদি থাকতে হবেঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হচ্ছে তার নাম;

খ. আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

গ. বিবাদীর নাম ঠিকানা ও পরিচয়;

ঘ. যে ইউনিয়নে অপরাধ ঘটেছে অথবা মামলার কারণের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম;

ঙ. সংশ্লিষ্ট বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও পরিমাণ;

চ. প্রার্থীত প্রতিকার;

ছ. আবেদনকারী লিখিত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করবেন।

উল্লেখ্য, কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা যাবে না। চেয়ারম্যান অভিযোগ অমূলক মনে করলে আবেদন নাকচ করতে পারেন তবে এ ক্ষেত্রে নাকচের কারণ লিখে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে।

নাকচের আদেশ অসৎ উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে বা মূলগত অন্যায় করা হয়েছে এ কারণ দেখিয়ে বিরুদ্ধ ব্যক্তির আবেদন অগ্রাহ্য করার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে পুনঃবিবেচনার জন্য যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজের (মুনসেফ) নিকট আবেদন করতে পারবেন। সহকারী জজ (মুনসেফ) যদি মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ দিয়েছেন তা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা যথার্থই অন্যায় তা হলে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াবম্যানকে আবেদন পত্র গ্রহণ করার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীকে তা ফেরৎ দিবেন।

আবেদনপত্র গৃহীত হলে ১ নং ফরমে, রক্ষিত রেজিস্ট্রার বইতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। রেজিস্ট্রী করার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করে আবেদনকারীকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিবেন এবং বিবাদীকেও অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় হাজির হবার জন্য সমন দিবেন। যে ব্যক্তিকে সমন দেয়া হবে, সে ব্যক্তির নিকট তা পাঠিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সমন জারী করতে হবে। সমনের জন্য প্রস্তের উল্টো পৃষ্ঠায় সমন প্রাপক প্রাপ্তি সূচক স্বাক্ষর দান করবেন। যদি সমন ব্যক্তিগতভাবে জারী করা সম্ভব না হয় তা হলে সমন জারীকারক কর্মচারি সমনের এক প্রস্ত বিবাদীর বসত বাড়ীর কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকিয়ে দিবেন

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্বারা সমন যথাযথভাবে জারী করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাইরে বসবাসরত ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে (প্রাপ্তি বিচার পত্রসহ) সমন পাঠাতে হবে। (বিবদীর নিকট ২নং করমে সমন পাঠাতে হবে)।

সমন জারি করার ১ সপ্তাহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়কে তাদের সদস্য মনোনীত করতে বলবেন এবং তাদের মনোনীত সদস্য নিয়ে চেয়ারম্যান গ্রাম আদালত গঠন করবেন।

গ্রাম আদালত গঠিত হবার পর চেয়ারম্যান বিবাদীকে তিন দিনের মধ্যে আবেদনের বিরুদ্ধে তার লিখিত আপত্তি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিবেন। গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ ও সময় নির্ধারিত করে পক্ষদ্বয়কে নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষী দাখিল করার জন্য চেয়ারম্যান নির্দেশ দিবেন।

চেয়ারম্যান নির্ধারিত তারিখে মামলা বিচার করবেন। গ্রাম আদালত সময়ে সময়ে শুনানী মূলতবী রাখতে পারেন। কিন্তু মূলতবীর মেয়াদ কোনভাবেই সাত দিনের বেশি হবে না।

চেয়ারম্যান স্বাক্ষীকে শপথ করিয়ে তার বক্তব্য রাখার জন্য বলবেন এবং তার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবেন বা করাবেন বিচারের যে কোন পর্যায়ে গ্রাম আদালত স্থানীয়ভাবে তদন্ত করতে পারেন।

যদি আবেদনকারী নির্ধারিত তারিখে হাজির হতে ব্যর্থ হন এবং চেয়ারম্যান যদি মনে করেন আবেদনকারী মামলা পরিচালনায় অবহেলা করছে তাহলে তিনি আবেদন নাকচ করতে পারেন। নাকচ হবার ১০ দিনের মধ্যে আবেদনকারী পূর্ণবহালের জন্য লিখিতভাবে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারেন এবং যদি অনুপস্থিতি কারণ সন্তোষজনক মনে হয় তা হলে চেয়ারম্যান আবেদনটি পূর্ণবহাল করে মামলার তারিখ নির্দিষ্ট করবেন।

অনুরুপভাবে বিবাদীর অবহেলাজনিত অনুপস্থিতির কারণে তার অনুপস্থিতিতেই চেয়ারম্যান মামলার শুনানী ও নিস্পত্তি করবেন। তবে দশ দিনের মধ্যে বিবাদী চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করবেন। অনুপস্থিতির কারণ সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হলে চেয়ারম্যান মামলাটি পূর্ণবহাল করে পুনঃশুনানীর জন্য তারিখ ধার্য করবেন।

২.৬ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও আদেশ বলবৎকরণ

গ্রাম আদালতের রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করতে হবে, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তার অনুপাত রায়ে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। রায়ের পর ৪নং করমে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত যদি সর্বসম্মত বা চার এক ভোটে গৃহীত হয় তা হলে উক্ত সিদ্ধান্ত পক্ষদ্বয়ের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনরুপ আপীল চলবে না।

যদি ৩ জন সদস্য একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেন তবে সে সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে না। সিদ্ধান্ত ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন পক্ষ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ (মুনসেফ)-এর আদালতে আপীল করতে পারেন।

গ্রাম আদালতের আদেশ (ডিক্রী) বলবৎকরণ

চেয়ারম্যান ৫ নং ফরমে ডিক্রী রেজিস্ট্রারে ডিক্রী লিপিবদ্ধ করবেন। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ডিক্রী দেবার পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ডিক্রী বাবদ অর্থ জমা না দিলে গ্রাম আদালত উক্ত পরিমাণ অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রীদারকে দেয়া হবে।

দেওয়ানী মামলার যে ডিক্রীর ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে বাস্তবায়নযোগ্য, সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সহকারী জজ (মুনসেফ)-এর নিকট ডিক্রী জারির জন্য এমনভাবে উদ্যোগ নেবেন যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত ডিক্রী দেয়া হয়েছে।

গ্রাম আদালতের জরিমানা

আইনসংগত কারণ ছাড়া নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রাম আদালত অবমাননার দোষে দোষী হতে পারেন ঃ

ক. আদালত চলাকালীন আদালতকে বা তার কোন সদস্যকে কাজ চলাকালে অপমান করা;

খ. আদালতের কোন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা;

গ. আদালতের কোন বৈধ প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;

ঘ. আদালতের আদেশ সত্বেও কোন দলিল দাখিল বা অর্পন করতে ব্যর্থ হওয়া;

ঙ. সত্য কথা বলার জন্য শপথ নিতে অস্বীকার বা আদালতের নির্দেশানুসারে প্রদত্ত জবানবন্দীকে দস্তখত করতে অস্বীকার করা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত যে কোন একটি অপরাধের জন্য গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য ৫০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। বিচারের স্বার্থে গ্রাম আদালত যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হতে/সাক্ষ্য দিতে/দলিল দাখিল করতে সমন দিতে পারেন।

আইনসংগত অজুহাত ব্যতিরেকে সমন প্রাপ্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হতে বা রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নয় এমন দলিলাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে তাকে বক্তব্য পেশের সুযোগ দেবার পর সংশ্লিষ্ট আদালত উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ২৫০/- টাকা জরিমানা করতে পারেন।

জরিমানা আদায়

আদালত অবমাননা বা সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার অপরাধে জরিমানা ধার্য হলে জরিমানার অর্থ যদি পরিশোধ করা না হয় তা হলে গ্রাম আদালত তথ্য উল্লেখ করে একটি আদেশ লিখবেন এবং তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাবেন। ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা আদায়ের এরূপ উদ্যোগ নেবেন যেন তা তৎকর্তৃক ধার্য হয়েছে এবং উক্ত জরিমানা অনাদায়ে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীকে কারা দন্ডের আদেশ দিতে পারবেন।

২.৭ সালিশ

গ্রাম আদালত ছাড়াও সালিশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যরা পল্লী এলাকার বিচার মীমাংসা করে থাকেন। ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন যাবত পল্লী এলাকায় সালিশ ব্যবস্থা চলে আসছে। সালিশের সরাসরি কোন আইনগত ভিত্তি না থাকলেও এর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। সালিশের উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ ও স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করা এবং এর মাধ্যমে আদালতের উপর বোঝা কমানো। সালিশ ব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল এখানে অনুভূতিকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মীমাংসার ক্ষেত্রে খোলাখুলি আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা যে সমস্ত বিচার করে থাকে তার বেশির ভাগই সালিশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২.৮ উপসংহার

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩তে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদকে ১০টি বাধ্যতামূলক এবং ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ অনির্ধারিত অনেকগুলি কাজ সম্পাদন করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের বিচার কার্য করার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ১৯৭৬। এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গঠিত গ্রাম আদালতকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের মামলা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রাম আদালতে ছোট খাট বিবাদ মীমাংসার ফলে গ্রামের মানুষ আইন আদালতের হয়রানির থেকে রক্ষা পায়।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদরে চেয়ারম্যান সদস্যরা গ্রাম আদালতের পদ্ধতি অনুসরণ করে বিচার কার্য পরিচালনা করে না। তারা শালিসের মাধ্যমে গ্রামে বহু বিবাদের মীমাংসা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বৃটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আমলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পল্লী উন্নয়নের যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায় বন্দোবস্তের পর থেকে শুরু করে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, পরবর্তী কালের গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি ও কুমিল্লা মডেলসহ পল্লী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি এ অংশে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।

৩.২ গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন

মোঘল সাম্রাজ্যের অবসান ও বৃটিশ আগমন

অষ্টাদশ শতাব্দিতে এ অঞ্চলে মোঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। মোঘল রাজত্বের অপসৃতির পরবর্তীকালে উপমহাদেশ জুড়ে আন্ত:প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র রূপ ধারন করে- বিশাল ভারতবর্ষ পতিত হয় একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে। মোঘল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি এবং বৃটিশ রাজত্বের সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অখণ্ডতা ও শৃংখলায় হঠাৎ করেই যেন এক ধরনের অস্তিরতা ও ক্ষয় দৃশ্যগোচর হয়ে উঠে। এ অবস্থার পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি নীতিগত কৌশল ছিল ইতিহাস পরম্পরায় গড়ে উঠা বাংলার লোকজ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা খর্ব করা। ঐ নীতিগত অবস্থানেরই অংশ হিসেবে ১৭৯৩ সালে নতুন জমিদারী ব্যবস্থার সূচনার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় স্ব-শাসনের উপর এক দফা ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালানো হয়। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগেও বাংলায়, বিশেষত পূর্ব বঙ্গে নানা কারণে লোকজ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বহু দুর্বলতা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনের শুরুর পর্যায়ে পূর্ববঙ্গে লোকজ স্থানীয় স্বশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্বল করে ফেলার শাসক-উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি বৃটিশদের সরকারি নথিপত্রে ভালোভাবেই সংকলিত হয়েছে। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল এক শতাব্দি শেষে স্পষ্টভাবে অনুমিত হয়েছিল। বাংলার ১৮৭১ সালের এক প্রশাসনিক রিপোর্টে উপরোক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে:

> "বৃটিশ শাসনামলের পূর্ব থেকে এবং বিশেষভাবে এর শেষ শতাব্দিতে সম্পদের জমিদারী-তন্ত্রের সময়ে বাংলার সমতল অঞ্চলে স্ব-শাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় হারিয়ে যায়।
>
> এটা বলা যাবে না যে, বর্তমান শাসনাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোতে কোন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নেই। সেরকম কিছু কিছু সন্ধান এখন পাওয়া যাচ্ছে-কোথাও কোথাও ঐ রকম প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত, হেডম্যান বা বয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে জমিদারী ব্যবস্থাই তাদের স্থান দখল করছে এবং ভূ-স্বামীরাই লোকজ স্ব-শাসনের জায়গায় নিজেদের স্থাপন করছে[৩]।"

ঐ একই রিপোর্টে নিম্নোক্ত কায়দায় ঐ সময়কার বাংলায় প্রশাসন চালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়:

> "তহশিলদাররা (গ্রাম রাজস্ব কর্মকর্তা) অনেক কিছুই করেছে ভারতের অন্যত্র, যা বাংলায় ঘটছে না। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আমাদের জানার আছে, যা আমরা জানি না। অথচ এই প্রদেশেই কি না আমরা সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে রয়েছি। অন্য প্রদেশের চেয়ে এখানকার মানুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কমই বলতে হয়, একই দুর্বলতা রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে যোগসূত্রেও। বাংলার মানুষের কাছে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের যাতায়াত কম, এখানে ধনাঢ্যরা কম নিয়ন্ত্রিত এবং গরীবরা কম সুরক্ষিত; এখানকার কৃষি, পরিসংখ্যানসহ নানা বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা তাই অসীম।[৪]"

এরকম একটি চিত্রের প্রেক্ষাপটেই বাংলায় অর্থনৈতিক ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আশংকাজনকভাবে অবনতি ঘটতে থাকে, বিশেষত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকালে। এ পর্যায়ে এসে বৃটিশরা অনুধাবন করে যে, এ দেশের প্রশাসন পরিচালনার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন রয়েছে।

৩.২.১ ১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইন

সে অনুযায়ী তখনকার সরকার ১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুন:স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই আইন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এরকম ক্ষমতা দেয় যে, তিনি একটি গ্রামে ৫ সদস্যের একটি পঞ্চায়েত নিযুক্ত করতে পারবেন। এই পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজ হলো গ্রামে আইন-শৃংখলা তদারকির জন্য 'চৌকিদার' নিয়োগ করা। চৌকিদারদের

---

[৩] Annual Bengal Administration Report of 1871 as quoted by Dr. Kamal Siddiqui, Local Government in Bangladesh, UPL, Dhaka, 1994, *p.* 34.

[৪] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বেতনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামে কর নিরূপন ও আদায় করতে পারতো। চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দু'টো দুর্বলতা ছিল- প্রথমত, এটা ছিল পুরোপুরি মনোনীত ব্যক্তিদের একটি সংস্থা, এতে কেউ মনোনীত হলে তার দায়িত্ব গ্রহণে আপত্তির সুযোগ ছিল না। সেরকম ক্ষেত্রে তার জন্য ৫০ টাকা জরিমানার বিধান ছিল। দ্বিতীয়ত, এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল আইন-শৃংখলা রক্ষায় ভূমিকা রাখা এবং এভাবে পরোক্ষে বৃটিশদের স্বার্থের স্বপক্ষে ভূমিকা রাখা[৩]। প্রকৃত সমাজকল্যাণমূলক কাজে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল কমই। উপমহাদেশে ১৮৫৭ সালের পরবর্তী বছরগুলো সাধারণভাবে চিহ্নিত হয় ইউরোপীয় শাসক চক্রের রক্ষণশীলতা ও পিতৃসুলভ ভাবভঙ্গীর স্মারক হিসেবে। তারপরও কিছু কিছু গভর্নর জেনারেল, যেমন- লরেন্স, মেয়ো প্রমুখ ভারতে অধিকতর স্ব-শাসনের উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত করেছেন। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্টেও স্থানীয় সংস্থার অনুপস্থিতিকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং দুর্যোগে দূর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে সাহায্য বিতরণে ভূমিকা রাখার প্রয়োজনে স্থানীয় স্ব-শাসনের বিস্তৃতি ঘটনোর তাগিদ দেয়া হয়।

সম্ভবত সেই তাগিদেরই ফল ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন কর্তৃক নেয়া স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিখ্যাত সেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। দেশব্যাপী দায়িত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলায় গভর্নর জেনারেলের আগ্রহ ঐ সিদ্ধান্তে স্পষ্টতা পায়। সেখানে গ্রামীণ প্রশাসনের মৌলিক বিষয়কগুলো- যেমন, সরকার কাঠামোর প্রাথমিক (Basic) একক হিসেবে তার বিচারসংক্রান্ত ভূমিকা, নির্বাচনের যৌক্তিকতা, স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থার কাজ ও দায়িত্বের বিষয়াবলী এবং তার সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের পদ্ধতিগত ধরন আলোচিত হয়। লর্ড রিপনের ঐ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় বিষয়াবলীর প্রশাসনিক কাজে বাংলার মানুষকে প্রকৃতই আগ্রহী করে তোলা এবং একই সঙ্গে তাদের সেসব দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। স্থানীয় স্ব-শাসনকে একটি যথাযথ বাস্তব প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়াও রিপনের উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল।

৩.২.২ ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার আইন

লর্ড রিপনের উপরোক্ত বিখ্যাত উদ্যোগের আইনগত ভিত্তি হিসেবে বেঙ্গল কাউন্সিলে ১৮৮৫ সালে 'স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার আইন' (Local Self-Government Act of 1885) পাস হয়। এটা ছিল গ্রামীণ বাংলার স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাসে এক মাইল ফলক। এই আইন গ্রামীণ পর্যায়ে তিন স্তরের স্থানীয়

[৩] Hugh Tinker, *Foundation of Local self-government in India, Pakistan and Burma*, London: Atheton Press. 1954. p. 40

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করে : ১. প্রতি জিলায় একটি জিলা বোর্ড, ২. জিলাস্থ মহকুমা স্তরে স্থানীয় আরেকটি বোর্ড, এবং ৩. কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি ইউনিয়ন কমিটি। এ সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলবেন কর্তৃপক্ষের হয়ে লেফটেনেন্ট গভর্নর[৯]। ন্যূনতম ২১ বছর বয়সী পুরুষ, যারা চৌকিদারী কর বা অন্য খাজনা দেয় অথবা যাদের বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে তাদেরই কেবল উপরোক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলায় ভোটের অধিকার থাকবে।

জিলা বোর্ড

প্রস্তাবিত জিলা বোর্ডে ন্যূনতম ৯ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। সাধারণভাবে দেখা গেছে জিলার আয়তন ও জনসংখ্যা ভেদে জিলা বোর্ডে ১৮ থেকে ৩৪ জন সদস্য থাকতো। স্থানীয়ভাবে কোন জিলায় যদি মহকুমা পর্যায়ে বোর্ড না থাকতো- তবে সেখানে বোর্ড-সদস্য নিয়োগ দেয়া হতো। মহকুমা পর্যায়ের স্থানীয় বোর্ড জিলা-বোর্ডে নূন্যপক্ষে অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত করতো এবং বাকিরা নিয়োগ পেতেন সরকারি চাকুরেদের মধ্য থেকে। উপরোক্ত আইন অনুযায়ী জিলা বোর্ডের সভাপতি হবেন ঐ জিলার ম্যাজিস্ট্রেট। জিলা-বোর্ডগুলোর মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। কোন বোর্ড-সদস্যকে নির্বাচিত করার অধিকারী ভোটারদের ঐ জিলার বাসিন্দা হতে হতো। আলোচ্য বিধি অনুযায়ী সিলেট ছাড়া বাংলার সকল জিলাতেই জিলা-বোর্ড গঠন করা হয়।

বাংলার স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে উপরোক্ত জিলা বোর্ডকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তার হাতে অর্পন করা হয় ব্যাপক-বিস্তৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব। জনগণের আগ্রহ ও প্রয়োজনের তাগিদ থেকে একটি জিলার বোর্ডকে অনেক বিষয়ই দেখাশোনা করতে হতো। যেমন, স্কুল-কলেজ, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাসপাতাল, টীকা দান ব্যবস্থা, দূর্যোগ ও দুর্ভিক্ষে ত্রাণ দেয়া, আদমশুমারী, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন, জল ও স্থল পথের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, নির্মাণ এবং বিশেষভাবে সরকারি ভবনাদি তৈরি।

জিলা বোর্ডের আয়ের মূল উৎস ছিল সরকারি বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে আহরিত বিভিন্ন ধরনের খাজনা, ভাড়া ও জরিমানা। মহকুমা পর্যায়ের স্থানীয় বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটি অর্থনৈতিকভাবে জিলা বোর্ডের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। আলোচ্য বিধি মহকুমা বোর্ডকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিল - তারা যেন অর্থবছরের শুরুতেই তাদের অর্থনৈতিক ও সম্পদগত চাহিদাপত্র, খরচপত্রের হিসাব নিয়মিত জিলা বোর্ডে পেশ করেন।

[৯] Lutful Hoq Chowdhury, Local Self-govrnment and its Reorganization in Bangladesh, 1987, Dhaka, NILG, p.9.

Dhaka University Institutional Repository

লোকাল বোর্ড

আইন অনুযায়ী মহকুমা পর্যায়ের বোর্ডে ন্যূনপক্ষে ৬ জন সদস্য থাকতে হতো। এই লোকাল বোর্ড সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হয়ে আসতেন। এবং বাকিরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। লোকাল বোর্ড সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে কাউকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে মাননীয় লেফটেনেন্ট গভর্নরের দপ্তরের কাছে অনুমোদন চাইতেন বা ঐ দপ্তরকেই অনুরোধ করতে হতো কাউকে চেয়ারম্যান মনোনীত করার জন্য। ইউনিয়ন কমিটিসমূহের প্রতিবেদন গ্রহণ ছাড়া মহকুমা বোর্ডগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন কাজ ছিল না। তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং ছিল না আয়ের কোন উৎস। জিলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবেই তার তৎপরতা সীমিত ছিল। জিলা বোর্ড তার উপর কোন ক্ষমতা অর্পন করলে- তবেই সেটার চর্চা করতে পারতো মহকুমাস্থ 'স্থানীয় বোর্ড'। সাধারণভাবে মহকুমা বোর্ড ইউনিয়ন কমিটিগুলোর তদারককারী সংস্থার মত ছিল - তারা প্রয়োজনে ইউনিয়ন কমিটিকে বিশেষ কোন কাজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করতো। এই মহকুমা বোর্ডগুলোর তদারকির জন্য কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গড়ে তোলা হয়।

ইউনিয়ন কমিটি

১৮৮৫ সালের আইন অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়ন কমিটি গ্রামীণ জনপদের গড়ে ১২ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হত। ইউনিয়ন কমিটিগুলো গঠিত হতো ৫ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে। এই সদস্যরা ইউনিয়ন এলাকার বাসিন্দাদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। পূর্ণ সদস্য সংখ্যা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ না হলে সেক্ষেত্রেই বিভাগীয় কমিশনার সদস্যদের নিয়োগ দিতে পারতেন। মূল আইনে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ১৯০৮ সালে 'বেঙ্গল গভর্নমেন্ট' এই মর্মে একটি সংশোধনী পাস করে যে, ইউনিয়ন কমিটির সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবে। এই সংশোধনীর আওতা ১৯১৪ সালে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি ইউনিয়ন কমিটি তার আওতাধীন এলাকার মিউনিসিপ্যাল কার্যাদির দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। যেমন, ছোট আকারের সড়ক নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, পুকুর ও ডোবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানাদি নথিবদ্ধ করা ইত্যাদি। মহকুমা বোর্ড অর্পন করলে ইউনিয়ন কমিটিকে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতো। নিজের আওতাধীন গ্রামে বাসিন্দাদের সম্পদ ও বাসস্থান থেকে অর্থ আদায়ের ক্ষমতা ছিল ইউনিয়ন কমিটির।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালের 'বেঙ্গল লোকাল সেলফ্ গভর্মেন্ট এ্যাক্ট'-এর ধারাসমূহ ঐ বছরের ১ অক্টোবর থেকে ঢাকা, বর্ধমান, রাজশাহী, পাবনাসহ ১৬টি জিলায় কার্যকর হয়। তবে বছর শেষ না হতেই প্রদেশ হিসেবে বাংলার প্রায় সর্বত্র এই আইনের পরিধি বিস্তৃত হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা। এই আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো খুব বেশি কার্যকর হতে পারছিল না, তাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্য এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পুরানো ঐতিহ্যের কারণে। অর্থ সম্পদের স্বল্পতার কারণে বিশেষভাবে কাজ কর্মে ব্যাঘাত ঘটেছিল জিলা বোর্ডের।

স্বল্প সম্পদের কারণে জিলা বোর্ড নিজে থেকে মহকুমা পর্যায়ের বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিকে কোন কাজের ভার দিতে পারতো, তবে পারতো না দিতে কোন অর্থ সহায়তা। আবার অনেক সময় সরকারি কর্মকর্তাদের ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দেয়া হতো বলে- এসব কমিটি প্রকৃত প্রস্তাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল হতো না। পরিবর্তে এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে নতুন একটি শোষক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল মাত্র। ১৯১৩-১৪ সালে 'দ্য বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিসট্রেশন কমিটি' উপরোক্ত প্রসঙ্গে এ মর্মে মন্তব্য করে যে, জিলা বোর্ডকে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রশাসনিক একক হিসেবে গড়ে তোলা এবং মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বোর্ড ও কমিটিকে জিলা বোর্ডের উপর অনুকম্পার জন্য নির্ভরশীল রাখা একটি মোটা দাগের ভুল হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থাকে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে - অথচ এটা নিজ থেকে বিকশিত হওয়ার দরকার ছিল।

এ পর্যায়ে এটা উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, গ্রামীণ স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকারের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল প্রথমে সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ে। প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য তাঁরা চেয়েছিলেন স্থানীয় মানুষকে সহযোগী হিসেবে পেতে। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সাধারণ মানুষ স্থানীয় সরকার সৃষ্টির দাবি জানিয়েছে। যে কারণে নবসৃষ্ট স্থানীয় সরকারগুলোর সাফল্য নির্ভর করছিল আসলে সরকারি পর্যায়ের সহযোগিতা ও সহায়তার উপর।

অন্তত পক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এই বিষয়টি সত্য ছিল। লর্ড রিপনের সিদ্ধান্ত সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে- যা কার্যত স্থানীয় বিষয়াদির প্রশাসনিক কর্তৃক গ্রহণে সক্ষম ছিল। এ পর্যায়ে দরকার ছিল সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সূচনা করা। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সৃষ্টি তথা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু ক্ষমতা দেয়া। এ ব্যাপারটি তখন হয়ে উঠেনি। যার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালের আইনটি দু'টি বিপরীত ধর্মী সমালোচনার মুখে পড়েছিল। সরকারি কর্মকর্তারা মনে করতেন- এ ব্যবস্থা প্রশাসনের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। যেমন, এডওয়ার্ড ভি লিভিং-এর নেতৃত্বে বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিসট্রেশন কমিটি (১৯১৩-১৪) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের তাগিদ দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১১) বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল সে সময় সেটাও এক পর্যায়ে নবগঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিরোধিতা শুরু করে।

৩.২.৩ ১৯১৯ সালের গ্রাম স্ব-শাসিত সরকার আইন

১৯১৯-এর আইনটি ছিল গ্রামীণ বাংলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রন্থিবদ্ধ করার দ্বিতীয় বড় ধরনের উদ্যোগ। এই আইন বিদ্যমান চৌকিদারী ব্যবস্থা ও ইউনিয়ন কমিটির পরিবর্তে 'ইউনিয়ন বোর্ড' নামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সিলেট ও পার্বত্য চট্রগ্রাম ছাড়া সকল জিলায় এই ইউনিয়ন বোর্ড গড়ে উঠে। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের গড় আয়তন ছিল ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল এবং গড় লোকসংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৮ হাজার।

ইউনিয়ন বোর্ড

ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে হবে ছয়- উর্দ্ধে নয়জন। সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হবে নির্বাচিত এবং বাকীরা হবেন মনোনীত। মনোনীতদের অন্তর্ভুক্তির দায়িত্ব জিলা ম্যাজিস্ট্রেটদের। সদস্য হতে হলে ন্যূনতম ২১ বছর বয়সী এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা হতে হতো। আরও শর্ত ছিল মনোনীত হওয়ার আগে-পরে তাদের ট্যাক্সদাতা হতে হবে। মূল নির্বাচন শেষে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি এবং অপর একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করতেন। সভাপতি ইউনিয়ন বোর্ডের মূখ্য নির্বাহী ছিলেন। সভাপতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কোন ইউনিয়ন বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরের নবগঠিত নতুন ইউনিটের দায়িত্ব ছিল তার কাজে পূর্ববর্তী চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটির কর্মের সম্মিলন ঘটানো। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল ঃ (ক) চৌকিদারদের তদারক করা, (খ) জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের তদারকি, (গ) সড়ক, সাঁকো ও নদীপথের রক্ষণাবেক্ষণ, (ঘ) স্কুল ও ডিসপেনসারিগুলো স্থাপন ও তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখা, (ঙ) জিলা বোর্ডের চাহিদামত সময় সময় তথ্যাদি প্রেরণ।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চস্তর থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া বরাদ্দ ছাড়াও ইউনিয়ন বোর্ডের অধিকার ছিল ইউনিয়ন পর্যায়ে বাৎসরিক কর ধার্য করার। এই কর ধার্য হতো মূলতঃ যারা কোন ভবনে বাস করছে বা ভবনের মালিকের উপর। বিধি মোতাবেক প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করলে ইউনিয়ন বোর্ডের দুই বা ততোধিক সদস্যকে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি কোর্ট গঠনের জন্য নিবাচিত করতে পারতো। এই কোর্ট স্থানীয় ছোট-খাটো বিবাদ মীমাংসা করতে পারতো। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম তদারক ও তার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল সার্কেল অফিসারের। সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের পরামর্শক হিসেবে থাকতেন এবং তিনি থানা ও জিলা প্রশাসনের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন। একেক জন সার্কেল অফিসার ২৫ বা ততোধিক ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ২/৩টি থানার ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর তদারকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশ অর্পিত হলে সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ড বিষয়ে অন্যান্য আরও অনেক ক্ষমতার চর্চা করতে পারতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের নথিপত্র, রেকর্ড বই ইত্যাদি উর্দ্ধতন বোর্ডের চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেটরা নিয়মিত পরিদর্শন করার নিয়ম ছিল। ২০ বছরের মধ্যে পুরো প্রদেশে ইউনিয়ন বোর্ড একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। ব্যবস্থাটি যে জনপ্রিয় ছিল এ থেকে তাই প্রতীয়মান হয়।

লোকাল বোর্ড

Levinge Report এই মর্মে সুপারিশ করেছিল যে, লোকাল বোর্ডগুলো যেন বিলুপ্ত করা হয়। তার পরিবর্তে এই রিপোর্ট থানা পর্যায়ে সার্কেল বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। ১৯১৯- এর স্ব-শাসিত আইনে লোকাল বোর্ডের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হয়নি। লোকাল বোর্ডের সদস্যদের উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করা হতো। জিলা পর্যায়ে এ ধরনের নির্বাচন তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ছিল। নির্বাচিত বোর্ড সদস্যরা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান বাছাই করতেন কাউকে। লোকাল বোর্ডের আরেকটি দায়িত্ব ছিল- মহকুমা পর্যায়ের সকল গণপূর্ত কাজের স্কীম তৈরি করা। এই স্কীম তৈরি করে তা জিলা বোর্ডের বরাবর পাঠাতে হতো অনুমোদনের জন্য। ধীরে ধীরে লোকাল বোর্ড ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় ও লুপ্ত হয়ে যায়।

জিলা বোর্ড

ঐতিহাসিক Levinge Report-এর একটি মূল লক্ষ্য ছিল '১৮৮৫ সালের স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার আইন'-এর ত্রুটির দিকগুলো সংশোধন করা। বস্তুত, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সতেজ হয়ে উঠতে না পারার কারণ

Dhaka University Institutional Repository

নিহিত ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীভূত চরিত্রের কারণে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো চলছিল উপরের স্তরের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হয়ে। এ বিষয়ে Levinge-এর সুপারিশসমূহ আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল কেবল ১৯১৯ সালের গ্রাম স্ব-শাসিত আইনে। কার্যত এই আইনে পুরানো ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করে নতুন কোন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়নি।

জিলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো-তবে তা কমপক্ষে নয় সদস্য বিশিষ্ট হতো। সাধারণত জিলার জনসংখ্যা ও আয়তন ভেদে জিলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা থাকতো ১৮ থেকে ৩৪-এর মধ্যে। সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ থাকতো নির্বাচিত এবং বাকিদের মনোনয়ন দেওয়া হতো। নির্বাচনে জিলার বাসিন্দারাই কেবল ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। ভোটারদের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর হতে হতো। ভোটার হওয়ার আরেকটি শর্ত ছিল তাঁকে একটি বিশেষ পরিমাণ খাজনা বা চৌকিদারী কর দিতে হতো। নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। অন্যদিকে মনোনীত সদস্যদের নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল প্রথমে বিভাগীয় কমিশনারের, পরে ১৯৩২ থেকে এ দায়িত্ব পালন করতেন স্থানীয় স্ব-শাসন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী। সদস্য মনোনয়ন করা হতো দুটো ক্যাটাগরীতে একটি ক্যাটাগরী ছিল সরকারি কর্মকর্তাদেব মধ্য থেকে, অন্য ক্যাটাগরীতে বেসরকারি ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া হতো। মনোনীত জিলা বোর্ড সদস্যদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যা মনোনীত বেসরকারি সদস্যদের অর্ধেকের বেশি হতো না। সরাসরি নির্বাচন এবং মনোনয়ন শেষে সকল সদস্য মিলে একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান নির্বাচন কবতেন। ভাইস-চেয়ারম্যানও নির্বাচন করা হতো এক বা দু'জনকে।

তবে ১৮৮৫ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত- জিলা ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯২১- এর পরই কেবল বোর্ড-কে নিজস্ব সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়- সেই নির্বাচন অবশ্য প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন পেতে হতো। চেয়ারম্যান সাধারণভাবে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ছিলেন। সরকার নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করতে পারতো : (ক) যদি তিনি ঐ পদের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হন, (খ) যদি তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, (গ) যদি তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন, (ঘ) যদি তিনি কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হন, (ঙ) যদি তিনি ক্রমাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন এবং (চ) যদি তাঁর প্রশাসন দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জিলা বোর্ডে চেয়ারম্যান পদটি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জিলা বোর্ডের সফলতা নির্ভর করতো অনেকাংশে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সামর্থ, পরিচালনা ও উদ্যোগী ক্ষমতার উপর। জিলা বোর্ডের প্রতিটি বড় নীতিগত সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত হতো বোর্ড মিটিংয়ে। নীতিগত সিদ্ধান্তের পর চেয়ারম্যান - বোর্ডের স্থায়ী স্টাফদের সহায়তায় ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন।

প্রতিটি জিলা বোর্ডের অনেকগুলো কমিটি থাকতো। কিছু কমিটি গঠিত হতো জিলা বোর্ড আইন অনুযায়ী, আবার প্রয়োজনবোধে বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকেও কিছু কমিটি সৃষ্টি হতো। সংবিধিবদ্ধ কমিটিগুলোর মধ্যে অর্থ কমিটিই ছিল মুখ্য, পরবর্তীকালে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আরও দুটি কমিটি গঠনের নিয়ম করা হয়।

অর্থ বিষয়ক কমিটির কাজ ছিল - বোর্ডের খরচাদির প্রয়োজন সম্পর্কে একটি ফর্দ তৈরি করা এবং অর্থ-সম্পদ ব্যবহারের রশিদ ও হিসাব সংরক্ষণ। শিক্ষা কমিটির কাজ ছিল বোর্ডের আওতাধীন স্কুলগুলোর অর্থ, হিসাব ও ব্যবস্থাপনাগত সকল বিষয়াদির তদারক করা। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটির কাজ ছিল জিলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করা। বিধিবদ্ধ এসব কমিটির বাইরেও কিছু কমিটি থাকতো জিলা বোর্ডে- যেমন, গণপূর্ত ও খেয়াঘাট সংক্রান্ত কমিটি।

জিলা বোর্ডের উপর উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সংক্রান্ত বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পিত ছিল। যেমন,

- **শিক্ষা** ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয় দেখা-শোনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল জিলা বোর্ড। তবে কার্যত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিই ছিল জিলা বোর্ডের শিক্ষা সংক্রান্ত তৎপরতার মূল অংশ। বোর্ড কখনো কখনো মাধ্যমিক স্কুলগুলোরও পৃষ্ঠপোষকতা করতো। চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিরও ব্যবস্থা করতো বোর্ড।

- **যোগাযোগ** ঃ জিলাস্থ রাস্তা, ব্রীজ, খাল ইত্যাদি যোগাযোগ খাতের বিষয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব ছিল বোর্ডের অন্যতম কাজ। এ সব যোগাযোগ কাঠামোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে হতো জিলা বোর্ডকে। অন্যদিকে জিলা বোর্ড চাইলে ব্যক্তিগত মালিকানার সড়ক, ব্রীজ, পুকুর, ঘাট, খাল, নালা ইত্যাদিও মালিকের সম্মতিতে সংস্কার ও উন্নয়ন ঘটাতে পারতো।

- **স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন** ঃ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনপদের জন্য মূল কর্তৃপক্ষ ছিল জিলা বোর্ড। ডিসপেনসারি ও হাসপাতাল স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষমতা ছিল জিলা বোর্ডের। স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের সহায়তায় জিলা বোর্ড 'খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ' সংক্রান্ত আইনের তদারকির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

করতো। মানুষের মাঝে টীকা দেওয়া এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহেরও দায়িত্ব ছিল জিলা বোর্ডের। শেষোক্ত প্রয়োজনে বোর্ড পুকুরসহ পানির উৎস সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করার অধিকারী ছিল।

- **অন্যান্য কাজ ও দায়িত্ব ঃ** জিলার কমিশনার চাইলে জিলা বোর্ডকে বিভিন্ন ধরনের শুমারী পরিচালনার জন্য বলতে পারতেন। ত্রাণ তৎপরতার প্রয়োজন দেখা দিলে বোর্ড নিজে থেকে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে পারতো। গবাদিপশু, কৃষিপণ্য ও স্থানীয় শিল্পজাত পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজনও করতো জিলা বোর্ড। ভ্রমনকারীদের প্রয়োজনে ডাকবাংলো ও সরাইখানা স্থাপন এবং তার ব্যবস্থাপনাও ছিল জিলা বোর্ডের একটি কাজ। প্রথম দিকে জিলা বোর্ডের সদস্যদের মেয়াদ ছিল তিন বছর। ১৯৩২ থেকে এটা ৪ বছর করা হয়। পরে ১৯৫৬ থেকে এই মেয়াদকাল হয় ৫ বছর।

  প্রদেশ হিসেবে বাংলায় জিলা বোর্ডের আয়ের উৎস ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। যে কারণে প্রতিনিয়ত এই প্রতিষ্ঠান তহবিলের অভাবে সংকটগ্রস্ত থাকতো। বোর্ডের আয়ের মূল উৎস ছিল স্থানীয়ভাবে আদায়কৃত বিভিন্ন ধরনের খাজনা, কর, জরিমানা, খেয়াঘাটের টোল, গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সরকারের বরাদ্দ।

- **খাজনা ঃ** ১৮৭১ সালের 'Road Cess Act' এর আওতায় ভূ-সম্পদ ও ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর খাজনা নির্ধারিত হয়েছিল। খাজনার হার গড়ে প্রতি একর ভূমিতে যে উৎপাদন হতো তার মূল্যের এক পঞ্চমাংশের বেশি ছিল না।

- **ভাড়া ও জরিমানার অর্থ ঃ** বোর্ড যে সব মেলা বা প্রর্দশনীর আয়োজন করতো তা থেকে ভাড়া আদায় হতো।

- **ফেরীঘাটের ভাড়া ঃ** জিলা বোর্ড অনেক স্থানে জনপথে যোগাযোগ নির্বিঘ্ন রাখতে খেয়াঘাটে ফেরী কিংবা অন্যকোন নৌযানের ব্যবস্থা করতো। তার বিনিময়ে যাত্রী সাধারণকে নির্ধারিত হারে ভাড়া দিতে হতো।

- **যানবাহন থেকে আয় ঃ** গাড়ীর মালিকদের উপর জিলা বোর্ড কোন করারোপ করতে পারতো না। তবে বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর ব্যবহারের ফলে সড়কে ক্ষয়ক্ষতি হতো বলে জিলা বোর্ড সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতো, আর এই দাবির বিপরীতে কি পরিমাণ অর্থ বোর্ডকে দেওয়া হবে তা সরকারই নির্ধারণ করতো।

- **সরকারি বরাদ্দ ঃ** বিভিন্ন খাতে জিলা বোর্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বোর্ডকে অর্থ বরাদ্দ দিত।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও বোর্ডের কাজ ও তৎপরতার ক্ষেত্র ক্রমাগত বাড়ছিলো। কিন্তু এর অর্থের সামর্থ দূর্বলই থেকে গিয়েছিল। যেমন, ইউনিয়ন বোর্ডকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে জিলা বোর্ড ছিল প্রকৃতই অসহায়, বোর্ডের মুখ্য উৎস ছিল ঐতিহ্যবাহী ভূমিকর। কে ল বড় অংকের সরকারি বরাদ্দ পেলেই জিলা বোর্ডের পক্ষে তাদের প্রকল্পগুলোর পরিধি আয়তনে ও সংখ্যায় বাড়ানো সম্ভব হতো।

অন্যদিকে জিলা বোর্ডের গঠন কাঠামো পূর্ণাঙ্গ অর্থে গণতান্ত্রিক ছিল না কারণ এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল সরকার মনোনীত। এমন কি বোর্ড সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিষয়টিও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। বোর্ড চাইলেই স্বাধীনভাবে কোন নীতিমালা গ্রহণ করতে পারতো না। বোর্ডের যে কোন সিদ্ধান্ত বা তৎকর্তৃক গৃহীত কোন নীতি সরকার অগ্রাহ্য করতে পারতো সে ক্ষমতা রাখা ছিল সরকারের হাতে। বোর্ডের সংবিধান, নীতিমালা তৈরি, গঠন কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক বিষয়াদি সর্বত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ উপস্থিত ছিল। এমনকি সরকার চাইলে জিলা বোর্ডকে বরখাস্তও করতে পারতো। এ রকম নিয়ন্ত্রিত অবস্থার ফল হয়েছিল এই যে, স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার কাঠামো হিসেবে জিলা বোর্ডের প্রকৃত বিকাশ ঘটেনি। সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে নিজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীদের বরখাস্ত করার কোন কর্তৃত্ব ছিল না জিলা বোর্ডের। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিও সন্তোষজনক ছিল না। তাদের পদোন্নতির সুযোগ ছিল সীমিত। কারণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চাকুরী গ্রেড আকারে সুবিন্যস্ত ছিল না। সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকে প্রেষণে জিলা বোর্ডে নিযুক্ত হতেন কিন্তু পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে তারা সেখানে কাজ করতেন, এমন বলা মুশকিল ছিল। আবার বাংলায় জিলাগুলোর আয়তন, জিলার কেন্দ্রে বসে প্রশাসন পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত বড়ই ছিল। জিলা বিভিন্ন প্রান্তের ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং জিলা বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান একজন চেয়ারম্যানের জন্য বেশ কঠিন ছিল। আবার বোর্ডের ছিল তহবিলের বড় অভাব। তহবিল ঘাটতির বড় কারণ ছিল সম্পদের স্বল্পতা এবং তার অনিয়মিত প্রাপ্তি।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসিত ভারত স্বাধীনতা পায়। সৃষ্টি হয় দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের; ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান দীর্ঘদিন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করেনি; বৃটিশ আমলের ব্যবস্থাটাই চলে আসছিল। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের সামরিক সরকার 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' জারি করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৪ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯

১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে প্রধানতঃ চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। যথা- (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল, (২) থানা কাউন্সিল (৩) জেলা কাউন্সিল, (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল। তাছাড়া প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। পরে ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ড এবং বিভাগীয় কাউন্সিল বাতিল করা হয়[৯]।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক ও বিবাহ আইন মারফত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিচার ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

একটা থানার আওতায় সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য। তাছাড়া থানা পর্যায়ের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য ও কো-অপারেটিভ বিভাগের অফিসারগণও থানা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য। তবে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা পদাধিকার বলে সদস্যদের অধিক হতে পারত না। মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সহ-সভাপতি ছিলেন। থানা কাউন্সিলের কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল না। থানা কাউন্সিল সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। রাষ্ট্রপতির আদেশ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিবর্তন করা হয়।

৩.২.৫ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭, ১৯৭২

এ আদেশে মৌলিক গণতন্ত্র বলে গঠিত সবকটি প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেয়া হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে দেয়া হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। সেখানে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে রাখা হয় থানা উন্নয়ন কমিটি এবং জেলা কাউন্সিলের নাম রাখা হয় জেলা বোর্ড।

---

[৯] Mohammed Abdul Aziz, The Union Parishad in Bangladesh: An Analysis of Problems and Directions of Reform, Dhaka, NILG, p.11

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৬ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালে ২২শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ২২ নং আদেশ জারি করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম ইউনিয়ন পরিষদ করা হয়। একটি ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে সদস্য এবং ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

৩.২.৭ স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। যথা- (১) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, (২) থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ ও (৩) জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ।

প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য, ২ জন মনোনীত (পরবর্তী সিদ্ধান্তে গৃহীত) কৃষক ও ২ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। এখানে ভাইস-চেয়ারম্যানের কোন বিধান নেই। অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদকে বিস্তৃত কার্যক্রমের ভার দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) পৌর কার্যাবলী; (২) রাজস্ব ও প্রশাসন সমন্বয় কার্যাবলী; (৩) নিরাপত্তা কার্যাবলী; ও (৪) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী। কার্যক্রমের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে আয়ের ব্যাপক উৎস দেয়া হয়েছে। গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ১৯৭৬ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদকে ছোটখাট বিচার কার্য সম্পাদনের জন্যও বেশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

৩.২.৮ স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

৩.৩ পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ

যে ভূখন্ড নিয়ে এখনকার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি গঠিত তা বর্তমানে যেমন গ্রাম ও কৃষি প্রধান-অতীতেও তাই ছিল এবং এরও বেশি মাত্রায় ছিল। শতাব্দির পর শতাব্দি এই অঞ্চল ছিল বিভিন্ন জাত ও বর্ণের বিদেশীদের পদানত ও শাসিত। কিন্তু এর গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর কোন মৌলিক রূপান্তরের উদ্যোগ কেউ যেমন নেয়নি তেমনি কোনভাবে তা সংগঠিতও হয়নি। খুব অল্প সংখ্যক সদাশয় শাসকের নাম করা যায়, যারা সাময়িক কল্যাণ চিন্তা থেকে সর্বোচ্চ কিছু সড়ক ও ব্রীজ তৈরি, পানির সহজ প্রাপ্যতার জন্য জলাধার খনন

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা সড়ক পাশে কিছু আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির কাজ করিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এখানে গ্রামীণ সমাজের ইতিবাচক উন্নয়ন বা রূপান্তরের সচেতন আয়োজন চোখে পড়ে কমই।

৩.৩.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩

ভারতবর্ষের সামাজ কাঠামোতে বড় ধরনের পরবর্তনের প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল বিশেষত বৃটিশ শাসনামলে। ১৭৯৩-এ বৃটিশদের দ্বারা সূচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ছিল এরকম কিছু পরিবর্তনের মূল অনুঘটক। বিশেষ করে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে উল্লিখিত আইনটি। এই আইন নতুন ধরনের একটি জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটায়। রাজস্ব আদায় নির্বিঘ্ন করা এবং উপনিবেশের আনুগত্য নিশ্চিত করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নে বৃটিশদের মূল লক্ষ্য। এই আইন এতদাঞ্চলের জমির মালিকানা 'জমিদার'দের হাতে তুলে দেয়। এই আইনের বদৌলতে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা নির্ধারণ ও আদায়ের অনেকটা স্বেচ্ছাচারসুলভ স্বত্ব পায়। বিপরীত দিকে ঐ জমির উন্নয়নে তারা বিনিয়োগ করতো না কিছুই। কালক্রমে, জমিদাররা রায়তদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের জায়গা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় শহরের বিলাসী জীবনে, খাজনা আদায় তথা রায়তদের জীবন জীবিকার কর্তৃত্ব তারা ছেড়ে দেয় তাদেরই সৃষ্ট নতুন মধ্যবর্তী একটি গোষ্ঠীর উপর। এই গোষ্ঠী, তহশীলদার সহযোগে প্রজাদের উপর শোষণমূলক একটি সম্পর্ক কায়েম করেছিল।

উপরোক্ত আইনটিতে প্রজা হিসেবে রায়তদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে কোন স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না বিধায় জমিদার এবং অন্যান্য খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগীরা খাজনা নির্ধারণ ও আদায়ে স্বেচ্ছাচারীতার আশ্রয় নিত। ফল হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে রায়তরা জমিদার ও তাদের নিয়োজিত লোকদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য বিক্ষুব্দ হয়ে উঠে। এই অসন্তোষ এবং খাজনা বন্ধের আন্দোলন ও প্রচারণা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন-এর সংস্কার সাধন করে ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' জারি করতে।

৩.৩.২ ১৮৮৫ সালের আইন

১৮৮৫ সালের আইন জমিদার কর্তৃক যখন তখন খাজনা বৃদ্ধি এবং জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদের বিপক্ষে রায়তকে কিছু সুরক্ষা দিয়েছিল। একই সঙ্গে এই আইনের আলোকে জমিদার ও রায়তের সম্পর্কের সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য কিছু আইনগত, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় বিধি-বিধান রচিত হয়। ক্রমে ক্রমে ১৮৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইনে কয়েক দফা (১৯২০, ১৯৩৮ এবং ১৯৪০-এ) সংশোধনী আনা হয়। প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার শক্তিশালী করাই ছিল এসব সংশোধনীর লক্ষ্য।

৩.৩.৩ এ কে ফজলুল হক এবং ভূমি সংস্কার

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। বাংলার গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে তিনি তাঁর কার্যকালে কিছু উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর স্বার্থে এসময়ই এ কে ফজলুল হক রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডিবেটরস এ্যাক্ট ১৯৩৫' পাস করান। বিগত শতাব্দির প্রথমদিককার ঐ সময়টিতেই বাংলার হাজার হাজার ক্ষুদে কৃষক, বিশেষত মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলায় (আজকের বাংলাদেশ) ধনী কৃষক ও সুদের ব্যবসায়ী মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে তাদের জমি হারাচ্ছিলো। কৃষি উৎপাদন সামগ্রী ক্রয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ধনী কৃষক বা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে একমাত্র সম্বল জমির বিনিময়ে অর্থ ঋণ নিতে বাধ্য হতো, অনেক সময়ই দেখা যেত সে ঋণ আর তারা ফেরত দিতে পারছে না-বিশেষত, ফসল উৎপাদনে বা তার মূল্যে মন্দা দেখা দিলে। ধনী কৃষক এবং মহাজনরা ক্ষুদে চাষীদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বন্ধকী সম্পত্তি আত্মসাৎ করতো এবং তাদের ভূমিহীনে পরিণত করতো। হাজারে হাজারে যখন এরকম ঘটনা ঘটছিল-তখনি এ কে ফজলুল হকের উদ্যোগে 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডিবেটরস এ্যাক্ট ১৯৩৫' অনুমোদিত হয়। এই আইনের ধারা অনুযায়ী জমি বন্ধক গ্রহীতা সর্বোচ্চ ১২ বছরের মধ্যে এটা তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিত বাধ্য হবেন। দেখা গিয়েছে, আইনটি কার্যকর হওয়ার পর অনেক বন্ধকদাতা বন্ধকী-শর্ত পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণের আগেই তাদের ভূ-সম্পত্তি ফেরত পান। এই কার্যকর ভূমি সংস্কার উদ্যোগ বৃহত্তর গরীব কৃষক সমাজের স্বার্থ সুরক্ষায়, বিশেষত মহাজনদের কাছ থেকে অনধিক বিলম্বে জমি ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন বিশ ও ত্রিশের দশকে কয়েক দফা সংশোধিত হয়। এর মধ্যে এ কে ফজলুল হকের উদ্যোগে সাধিত ১৯৩৮ সালের সংশোধনী ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশোধিত সে আইনের নাম ছিল Bengal Tenancy Act 1938. এই আইনের বিধান অনুযায়ী:

১. দখলি স্বত্বের অধিকারী রায়তকে হস্তান্তর কর থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। দখলি ভূমি পূর্ণ বা আংশিক স্বাধীনভাবে হস্তান্তর করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জমিদার এ ধরনের হস্তান্তর অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকবেন;

Dhaka University Institutional Repository

২. জমিদারের বদলে জমি ক্রয়ের অগ্রাধিকার থাকবে ঐ জমির চাষে অংশ-ভাগ রায়েছে এমন রায়তের;

৩. পূর্বোক্ত আইনে খাজনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত যেসব বিধান ছিল তা পরবর্তী দশ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়।

সংশোধিত আলোচ্য আইনটি কৃষকদের জন্য এ কারণে আরও স্বস্তির কারণ হয়েছিল যে, তা রায়ত, অংশভাগী রায়ত ও দখলদার রায়তদের অধিকতর অধিকার দিয়েছিল[৮]।

তখনকার বাংলার শিক্ষা বিস্তারেও এ কে ফজলুল হক প্রথমবারের মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেন। বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য তাঁর উদ্যোগ ও সহায়তায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল সংখ্যক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি মনে করতেন গণঅশিক্ষা দূর করা না গেলে কখনোই এখানে গ্রামীণ বিকাশ সম্ভব হবে না। তাঁর এই ভাবনারর ফল ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো। বলা বাহুল্য, বাংলায় গ্রামীণ উন্নয়নে তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহ সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল।

৩.৩.৪ নুরুন্নবী চৌধুরীর গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্যোগ

বাংলায় গ্রামীণ বিকাশে এ কে ফজলুল হকের সমসাময়িক আরেকটি উজ্জ্বল নাম টি আই এম নুরুন্নবী চৌধুরী। তিনি তৃণমূল উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কে খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং "প্রায় তাঁর সমগ্র জীবনই ব্যয়িত হয় গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রীক ভাবনা, লেখালেখি ও তার অনুশীলনে"[৯]।

১৯৩১ থেকে ১৯৪২ সময়কালে জনাব চৌধুরী পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জিলায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকার সময় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন 'পল্লী মঙ্গল সমিতি' ধর্মী সংগঠন গড়ে তার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য। উন্নত বীজ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে মিলনায়তন, বিদ্যালয় এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল নিরন্তর। গ্রামীণ বিকাশে নুরুন্নবী চৌধুরীর আগ্রহের কারণেই সরকার ১৯৩৮ সালে নতুনভাবে সৃষ্ট গ্রাম-পুনর্গঠন বিভাগের প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব দেন তাঁকে। এই দায়িত্ব লাভ করে তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রাম কমিটি গঠন, গ্রামীণ মানুষ ও জনপদের চাহিদা বোঝার জন্য জরিপ পরিচালনা, কৃষির বিকাশ সাধন, বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়া, নর্সারী তৈরি, গবাদিপশু পালনের ধরনে উন্নয়ন ঘটানো, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিশুদ্ধ খাবার পানির উৎস সৃষ্টি ও

---

[৮] M.N. Huq Pioneers of Rural Development in Bangladesh, Their Programmes and Writings. Bogra, RDA 1978.
[৯] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সরবরাহ, টীকা দান, রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ, মৎস চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন ইত্যাদি কর্মসূচি। তাঁর উদ্যোগের সরাসরি ফল যাই হোক না কেন, তিনি জনগণকে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনের ব্যাপারে অন্ততপক্ষে সচেতন করতে পেরেছিলেন এবং তার উপায়ও নির্দেশ করেছিলেন। জনাব চৌধুরী আজীবন উপরোক্ত লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে সচেষ্ট ছিলেন, এমনকি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও।

৩.৩.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ

এই শতাব্দির শুরুর দিকে এবং মধ্য পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক আরও কিছু ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্মদ্যোগে গ্রামোন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদেরই একজন। বাংলার গ্রাম পুনর্গঠনে তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগ বাস্তবে চর্চার সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। তিনি বিশেষভাবে কৃষিতে সমবায়ের বিকাশ সাধনের কথা বলতেন। তাঁর একটি গ্রাম-বিকাশ কর্মসূচির নাম ছিল 'শ্রী নিকেতন'-যার আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল 'পল্লী মঙ্গল সমিতি', স্বাস্থ্য-সমবায়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, এবং বিতরণধর্মী একটি গ্রন্থগার।

৩.৩.৬ এন এম খান এবং এইচ এস এম ইসহাকের গ্রাম বিকাশ কর্মসূচি

এন এম খান এবং এইচ এস এম ইসহাক-দু'জনই ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। ত্রিশের দশকে তাঁরা দু'জন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে পল্লী উন্নয়নের আন্তরিক কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এন এম খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুরোপুরি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এমন একটি খাল পুন:খনন করেছিলেন-যা ঐ অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগের জন্য ছিল অপরিহার্য। আর এইচ এস এম ইসহাক পল্লী উন্নয়নের কিছু কর্মসূচি নিয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ পর্যন্ত গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কিছু উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিকভাবে তার ধরন ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। "বৃহত্তর অর্থে ধারণা হিসেবে গ্রামান্নোয়ন বলতে যা বুঝায়, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে পল্লীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর বিকাশ ও রূপান্তরের নিশ্চয়তা এবং যা এই বিষয়গুলোকে ধারণ করে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়-তা উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে ছিল অনুপস্থিত[১০] "।

---

[১০] M. Husain, Rural Development and Rural Institutions, Mymensingh, mimeo, 1978, *p.* 6.

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৭ ১৯৫০-এর জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন

১৯৪৭-এ দেশভাগ এবং নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্মের পর দেখা গেল পূর্ববাংলা কেন্দ্রীক হিন্দু জমিদার ও বড় বড় হিন্দু জোতদাররা সবাই ধীরে ধীরে ভারতমুখী হচ্ছেন। এ পর্যায়ে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সভায় ১৯৫০ সালে অনেকটা নির্বিবাধেই পাস হয়ে যায় Zamindari Abolition Act। অনেকের বিবেচনায় ১৯৫০-এর এই আইনটি এ অঞ্চলের ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ ছিল। যার পরিণতিতে ১৯৫০-এর পুরানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের যবনিকাপাত অনিবার্য হয়ে উঠে এবং তার পরবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে জমির প্রকৃত মালিক বা চাষীদের দ্বারা সরাসরি ভূমি রাজস্ব প্রদানের সূচনার মধ্য দিয়ে খাজনা আদায়ের সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ ঘটে। এই আইন অনুযায়ী, খাজনা সংক্রান্ত সকল স্বার্থ-জমি অধিগ্রহণের মুহূর্ত থেকে সরকারের স্থায়ী রূপে গণ্য হবে। এই আইনের আওতায়, খাজনা আদায়কারী হিসেবে কেউ, প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে ৩৭৫ বিঘা বা তার পরিবারের প্রতি সদস্যের বিপরীতে ১০ বিঘা সমমূল্যের ভূমি (যেটা বেশি হয়) রাখতে পারবেন। খাজনা আদায় স্বত্ত্ব অধিগ্রহণের ফলে প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপনের বিধান রাখা হয়েছিল ১৯৫০-এর এই Zamindari Abolition Act-এ। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানা বহির্ভূত খাস জমির মর্যাদা ও ভোগাধিকার বিষয়েও উল্লিখিত আইনে নির্দেশনা ছিল। এই আইন বলে-সরকারের অধীনস্থ কৃষি-খাজনাধারীদের মর্যাদা সুনির্দিষ্ট হয় একটি শ্রেণিতে- তারা হলো 'রায়ত'। জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের মধ্য দিয়ে রায়তরা সরকারের অধীনে সরাসরি জমির অধিকার সংরক্ষণের সুযোগ পেলেন। এই আইন তাদের 'মালিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একজন রায়ত তার অধীনস্থ বসত ভূমির মালিকানা পেলেন, যা উত্তরাধিকারযোগ্য এবং বিনিময়যোগ্য। রাজস্ব দিয়ে একজন 'মালিক' তার ভূমি যেকোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পরবেন-এমন বিধানই হলো।

৩.৩.৮ গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি

১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার 'গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি' [Village Agricultural and Industrial Development Programme (V-AID)]-এর সূচনা করেছিল। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন, তথা- দেশজুড়ে গ্রামে বসবাসকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অগ্রগতি ঘটানো।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে গ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তার সংহতি, তার শুভ-ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা- বৃহত্তর অর্থে যে গ্রামের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল সেটারই স্বীকৃতি ও প্রতিফলণ ঘটেছিল 'গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি'র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান গ্রামের দেশ- প্রতি সাত জন মানুষের মধ্যে ছয় জনের আবাস গ্রাম। দেশের মুখ্য সম্পদ ছিল গ্রমীণ এই মানুষরাই। স্বাভাবিকভাবেই এরকম একটি দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় গ্রামের মানুষের বিকাশ ও কল্যাণই নিশ্চিতভাবে মনযোগের পুরোভাগে থাকার কথা।

পরিকল্পনাকারীদের ভাষ্য মতে, 'গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি'র সূচনার পেছনে কিছু বিবেচনা কাজ করেছে। তা হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুর সময় বিভিন্ন বিভাগের জাতীয় পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপের আওতায় গ্রামীণ জনপদের পরিবর্তন অনেক অঞ্চলেই আশানুরূপ পর্যায়ে ছিল না। তার কারণ বহুবিধ :

ক. ঐ সব পদক্ষেপ সুসমন্বিত ছিল না এবং সচরাচর তা কিছু সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোন থেকে নেয়া হয়, যার ফলে তার বাস্তবায়ন সীমিত পরিসরে গন্ডিবদ্ধ ছিল;

খ. গ্রামের জন্য যেকোন পদক্ষেপে যে ধরনের কার্যকর পদ্ধতিতে নেয়া দরকার- সেরকম কৌশলগত জ্ঞানেরও অভাব ছিল তখন। ফলে ঐসব তৎপরতা গ্রামবাসীদের সন্দিগ্ধ মনোভাবকে অতিক্রম করে বিশেষ কোন ফলোদয় ঘটাতে পারেনি;

গ. ভিন্ন ভিন্ন সরকারি দপ্তর তাদের স্বতন্ত্র সব লক্ষ্য নিয়ে কাজে নেমেছিল। কাঠামোগতভাবে এসব দপ্তর যে রকম পৃথক, গ্রামীণ জনজীবনকে উন্নয়নের নামে সেভাবে বিভক্ত করার দিকেই ছিল তাদের ঝোঁক;

ঘ. বিভিন্ন বিভাগের তৎপরতা গ্রামীণ মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় আবেদন তৈরি করতে পারেনি। কারণ সাধারণ জনসাধারণের প্রাথমিক এবং তাৎক্ষণিক দরকার ছিল ভিন্নধর্মী- যা সরকার পরিচালিত কর্মসূচিগুলো এড়িয়ে গেছে;

ঙ. উদ্যোগগুলোর ধরন ছিল কৃত্রিম, তাৎক্ষণিক এবং আকস্মিক ধাঁচের; মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্য ছিল তাতে অনুপস্থিত;

চ. বিভিন্ন বিভাগের 'উন্নয়ন তৎপরতা'য় তহবিলের যোগান থাকতো স্বল্পমেয়াদি এবং তার পুন:সরবরাহ হতো কদাচিৎ;

ছ. অধিকাংশ কর্মসূচির উপর থেকে চাপানো হতো, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়া হতো তার পরিকল্পনা- গ্রামবাসীদের শুধু বলা হতো পরিকল্পনাটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য। প্রবণতাটি থাকতো এরকম- গ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞানই সর্বোত্তম। এ প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘ ঐতিহ্যের পুঞ্জিভূত জ্ঞান অবজ্ঞার শিকার হতো। উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণের চর্চা ছিল না- ঐসব কর্মসূচি প্রয়োগে তাদের সহযোগিতাও খোঁজ হতো না। ফলে কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে গ্রামের মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ থাকতো অনুপস্থিত। সরকারি বিভাগগুলোকে তারা যেসব তৎপরতার জন্য অনুরোধ করতেন- তা গৃহীত হতো না;

ক. গ্রামজীবন ও গ্রামের মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হতো বলে উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো হতো অবাস্তব ধাঁচের; এবং

খ. দেশভাগ-পূর্ব সময়ে এমনিতে উন্নয়ন তৎপরতার চেয়ে আইন-শৃংখলা প্রশাসন খাতে সরকারি মনযোগ ছিল বেশি। প্রথমোক্ত ক্ষেত্র গুরুত্ব পেয়েছে কম।

এসবের মিলিত ফল হিসেবে গ্রামাঞ্চল নানাভাবে পিচিয়ে পড়ে। যেমন,

ক. কৃষি বিষয়ক প্রশাসনিক সহায়তা এবং উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ততা; কৃষি পণ্যের কম ভোগ এবং তার নিরবিচ্ছিন্ন বিপণন কাঠামোর অনুপস্থিতি;

খ. স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধার অপর্যাপ্ততার সঙ্গী ছিল মৃত্যু ও রোগ বালাইয়ের উচ্চহার এবং জনগণের স্বল্প আয়ু;

গ. কুটির শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন সামর্থ্যের স্বল্প ব্যবহার, গুণগত মানের সংকট এবং তার অল্প চাহিদা;

ঘ. সাক্ষরতার নিম্ন হার এবং সাংস্কৃতিক অর্জনে দৈন্যতা; এবং

ঙ. স্থানীয় সরকারে মানুষের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ ও সাধারণ উন্নয়ন সমস্যায় পারস্পরিক সমবায়-উদ্যোগের অনুপস্থিতি।

এটা আশা করা হয়েছিল যে, 'গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি' উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করে জাতীয় বিনির্মাণে নিয়োজিত বিভাগগুলোর ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে। অতীতের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশলে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান ও নীতিমালাকে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল ঐ কায়দায় গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করা এবং অতীতের ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসা।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের প্রতিবেদনে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়নের ধারণার মৌলিক নীতি ও উপাদানের যে উপস্থাপনা ছিল তাই ছিল 'গ্রামীন কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি'র নীতিগত ভিত্তি . যা ছিল নিম্নরূপ:

১. গ্রামীণ কর্মসূচি অবশ্যই যেকোন কমিউনিটির মৌলিক চাহিদামুখী হতে হবে। প্রকল্পগুলোর সূচনা ঘটাতে হবে মানুষের চাহিদার অভিব্যক্তির আলোকে;

২. ভিন্ন ভিন্ন খাতে অসমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব। তবে পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ কমিউনিটি-উন্নয়ন বহুমুখী কর্মসূচির সমন্বিত উদ্যোগ ও অবকাঠামো দাবি করে;

৩. কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক পর্যায়ে বস্তুগত অর্জনের মতোই সেখানকার মানুষের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানোটাও জরুরি;

৪. কমিউনিটি-উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো কমিউনিটির বিষয়াদিতে স্থানীয় অধিবাসীদের বর্ধিত সংখ্যায় এবং অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণ ঘটানো। এটা ঘটতে পারে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামোগত সংশোধন ও নবায়নের মাধ্যমে তাকে কার্যকর ও ফলদায়ক করে গড়ে তোলার মাধ্যমে;

৫. উপরোক্ত ধাঁচের যেকোন কর্মসূচির অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় নেতৃত্ব শনাক্তকরণ, তাকে উৎসাহ যোগানো এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া;

৬. কমিউনিটিভিত্তিক প্রকল্পগুলোতে নারী ও তরুণদের যদি ব্যাপকতর আস্থা ও ভরসা থাকে তাহলে উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বিশেষ দীপ্তি পায়, সেগুলো একটি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নিজেদের স্থাপন করে, তাদের দীর্ঘমেয়াদী বিস্তৃতির ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়;

৭. স্ব-স্বার্থে পরিচালিত কমিউনিটিভিত্তিক প্রকল্পগুলো পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের নিবিড় ও ব্যাপকতর সহায়তা থাকতে হয়;

Dhaka University Institutional Repository

৮. জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোক্তাদের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন নীতিগত নিরবিচ্ছিন্নতা, বিশেষ প্রশাসনিক আয়োজন, প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সংগ্রহ ও তার প্রশিক্ষণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সমাবেশ। পাশাপাশি থাকা দরকার গবেষণা, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা;

৯. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কমিউনিটি-উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংগঠনগুলোর সম্পদরাজির পূর্ণ ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন;

১০. স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিগুলো জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত সমান্তরাল উন্নয়ন উদ্যোগ অপরিহার্য করে তোলে।

গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি (Village Agricultural and Industrial Development Programme) রাষ্ট্রকে উন্নয়নের অগ্রপথিক করার ধারণা এনেছিল। "কিন্তু এ কর্মসূচি খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ কর্মসূচির ব্যর্থতার কারণ ছিল তৃণমূল পর্যায়ে জন অংশগ্রহণের অভাব এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও সাহায্যের উপর অতি নির্ভরশীলতা। ১৯৬১ সালে ভিলেজ এইড (V-AID) কর্মসূচি বিলুপ্ত হয়[১১]"।

৩.৩.৯ কুমিল্লা মডেল

১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর কুমিল্লা কোতয়ালী থানার সমগ্র এলাকা (১০৭ বর্গ মাইল) সরকার উন্নয়ন গবেষণাগার হিসেবে অর্পন করে ও বার্ডের পরিচালককে কর্মসূচি পরিচালনার এবং প্রশাসনিক গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। এই এলাকায় দশ বছর ক্রমাগত গবেষণার ফসল হল পল্লী উন্নয়নের কুমিল্লা মডেল।

পূর্বে পল্লী উন্নয়নের যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলির দুর্বলতা চিহ্নিত করে এই মডেল তা পরিহার করে। তারা সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের ভৌত (Physical) এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করে এবং পল্লী উন্নয়নের জনঅংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে।

কুমিল্লা মডেল নির্মার্ণের উপাদানগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন ভিত্তির উপর গবেষণা করে। প্রশাসনিক অবকাঠামোর ভিত্তি ছিল ভারতীয় অভিজ্ঞতা। চীন এবং তাইওয়ান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল ভৌত

[১১] Anwarullah Chowdhury, Agrarian Social Relations and Rural Development in Bangladesh, Oxford & IBH Publishing Co., Delhi, 1982, *p.* 76.

Dhaka University Institutional Repository

অবকাঠামো ও পল্লী কর্মসংস্থানের ধারণা।সমবায় কৃষির বিষয়টি নেয়া হয়েছিল ডেনমার্ক, জাপান, তাইওয়ান ও চীন থেকে। ডেনমার্কেল ফোক হাই স্কুল থেকে এসেছিল পল্লী অঞ্চলের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ধারণা। এ বিষয়ে আকতার হামিদ খান বলেন, "For mental improvement of our villagers we imitated the early Danish Folk-schools, as we imitated the early German cradit unions for economic improvement of our peasants. We were fond of stealing antique ideas[১৭]"

যদিও কুমিল্লা মডেলের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো বিদেশী অভিজ্ঞতার আলোকে কিন্তু তারপরও কুমিল্লা কোতয়ালী থানার নিজেদের গবেষণাগারে ক্রমাগত গবেষণা ও পরীক্ষা নিরিক্ষার আলোকে মডেলটি বিকশিত হয়েছিল।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কুমিল্লা মডেল বাংলাদেশের অতীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির দুর্বলতা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। পূর্ত কর্মসূচির (works programme) স্কিম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা পল্লী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে ও পল্লী সমবায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কৃষিকে আধুনিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্বপরি উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কুমিল্লা মডেল এইভাবে পল্লী অঞ্চলের কৃষি ও অকৃষি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। স্থানীয় সরকারকে উজ্জিবিত করা হয়েছিল এবং স্থানীয় সরকারের একটা নতুন স্তর থানা কাউন্সিল সৃষ্টি করা হয়েছিল থানা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা কার্যকর সমন্বয় তৈরি করার জন্য।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য রাত্রিকালীন স্কুল করাও ছিল কুমিল্লা নিরীক্ষার অংশ। আর ছিল গ্রাম্য দাইদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি পরিচালনা এবং এসবের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

বার্ড-কুমিল্লা থেকে গ্রামোন্নয়নের চারটি মডেলের বিকাশ ঘটে। তার মধ্যে ছিল:

ক) গ্রামীণ প্রশাসনের উন্নয়ন এবং থানায় প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (TTDC) সৃষ্টি

এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে এই ধারণা কাজ করেছিল যে, সাধারণ জনগণ তাদের নির্বাচিত নেতাদের মাধ্যমে সংগঠিত হবে, আর কর্মকর্তারা একদিকে তাদের পরস্পরের বিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটাবেন এবং অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও তাদের তৎপরতাকে সমন্বিত করবেন।

[১৭] A.H. Khan "The Comilla Projects: A personal Account" in BARD (compiled), The Works of Akhter Hamid Khan, Vol. II. BARD 1983, *p.* 155.

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (TTDC) হবে উন্নয়ন তৎপরতার পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু একই সঙ্গে তা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র-ভূমি হিসেবেও কাজ করবে। কেন্দ্রে বিশেষভাবে নির্মিত মিলনায়তন এবং শ্রেণিকক্ষ থাকতো আর গ্রামবাসীদের পাঠ ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য থানাস্থ কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা হতো।

উপরোক্ত ধারাবাহিকতাতেই, 'থানা কাউন্সিল' নামে একটি নতুন স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। এই 'থানা কাউন্সিল' গঠিত হতো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং জাতীয় বিনির্মাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে। থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে একদিকে থাকতো কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগীয় কার্যালয়, আর অন্যদিকে সেখানে 'থানা কাউন্সিল'-এরও দপ্তর থাকতো। থানার কর্মকর্তা এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের দ্বারা গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে আলোচ্য ধাঁচে TTDC-এর বিকাশ ঘটানো হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই মর্মে নিজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিয়েছিল যে, প্রত্যেক থানায় একটি করে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র থাকবে[১০]। এই TTDC গুলোতে ছিল অন্য অনেক দপ্তরের পাশাপাশি 'থানা কাউন্সিল' ও থানাস্থ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যালয়। এসব কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিত্ব ও কাজের বাস্তবায়ন করতেন। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে - TTDC গুলোতে থাকতো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। গ্রামীণ জীবনধারার জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়তামূলক আরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা থাকতো কেন্দ্রে - যেমন, থানার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যালয়, কৃষকদের একটি ব্যাংক, একটি ওয়ার্কশপ এবং একটি গোডাউন। TTDC-তে সকল সার্ভিস-সংস্থার দপ্তর এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রও থাকতো। থাকতো স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র, হাঁস-মুরগি-মৎস ও ধান চাষের প্রদর্শনী কেন্দ্র, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ইত্যাদি। বার্ড-কুমিল্লা কর্তৃক বিকাশ সাধিত এবং দেশব্যাপী সকল থানাতে প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত TTDC গুলোতে গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্যও পরিসর থাকতো।

---

[১০] Government of East Pakistan, Department of Basic Democracies and Local Government, Circular Number SIV/WP-45/63, Dhaka, July 1, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

খ) নর্দমা ও সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি (গ্রামীণ পূর্ত কার্যক্রম)

এই কর্মসূচির দু'টি লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়ত, অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য শীতের সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। একটি এলাকায় এইরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকতো স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে গঠিত 'প্রকল্প কমিটি'র, আর তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হতো সেখানকার শ্রমজীবীদের। 'থানা কাউন্সিল'-এর অগ্রাধিকারবর্তী একটি কাজ ছিল - উক্তরূপ প্রকল্পের মাধ্যমে নর্দমা ও সড়কাদি তৈরি এবং তার উন্নয়ন - যেন বন্যার হাত থেকে ফসলাদি রক্ষা পায়, পাশাপাশি গ্রাম ও বাজারের মধ্যে সংযোগ গড়ে উঠে[১৪]।

গ) সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি

শীতে কৃষি কাজে বাংলাদেশে বরাবর সেচের প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করা। এই মডেল-কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল : সেচ সুবিধার লক্ষিত কৃষকদের নিয়ে 'সেচ গ্রুপ' গঠন, লিফট্ পাম্প ও টিউবয়েল কার্যক্রম গড়ে তোলা, মাঠ পর্যায়ে সেচ-খাল তৈরি, পানি বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সেচ-যন্ত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'সেচ গ্রুপ' ম্যানেজার ও পাম্প চালকদের প্রশিক্ষন দান।

ঘ) সমবায় প্রকল্প

কুমিল্লা সমবায় মডেল গ্রামীণ সমাজের বৃহৎ অংশ কৃষক-মালিকদের সংগঠিত করেছিল। ছোট ছোট দলে সংগঠিত এসব সমবায়-গ্রুপকে সমবায়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও অনুশীলন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো। গ্রামীণ সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্যতম শক্তি হিসেবে সমবায় গ্রুপগুলো এই ধারণার বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরূপ সমবায় কর্মসূচি শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে - তাই নয়, টাকা ধারের মহাজনী ব্যবস্থা থেকেও তা কৃষক সমাজকে রক্ষা করেছিল। উপরন্তু এটা কৃষক সমাজে একটি আত্মরক্ষা ও সংহতির চেতনা গড়ে তোলে। মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে 'কুমিল্লা সমবায়-মডেল' কৃষকদের শিখিয়েছিল কীভাবে পুঁজি গড়ে তুলতে হয়। সাধারণভাবে দু'একর পরিমাণ জমির মালিকরা তাদের ক্ষুদ্র জোত ও অর্থ-স্বল্পতার

---

[১৪] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে প্রয়োজন সত্ত্বেও পাম্প বা ট্রাক্টর ক্রয় কিংবা ব্যবহার করতে পারতেন না - কিন্তু সমবায়ের যৌথ ব্যবস্থাপনা তাদের সে সুবিধা দিয়েছিল[৩৫]।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংস্থা। এ সংস্থার দায়িত্ব পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল সারা দেশে সম্প্রসারণ করা এবং পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা।

৩.৩.১০ বেসরকারি সংস্থা

সরকারি উদ্যোগের বাইরে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে কাজ করছে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও বেসরকারি সংস্থা হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র দূর করা। এ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

এসোসিয়েশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট (আশা)

একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে এসোসিয়েশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট (আশা) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর জন্য এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সংস্থাটি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে থাকে।

গ্রামীণ ব্যাংক

দল ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন ও দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করার জন্য ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ভূমিহীন গরীবদের কাছে যদি যুক্তিসঙ্গত শর্তে কিছু মূলধন দেওয়া যায় তবে তা ব্যবহার করে তারা দারিদ্র্যতা হ্রাস করতে পারবে।

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

---

[৩৫] A.H. Khan "The Comilla Projects: A personal Account" in BARD (compiled), The Works of Akhter Hamid Khan. Vol II. BARD 1983, p. 150.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭২ সালে। এ সংস্থার কর্মসূচির উদ্দেশ্য গ্রামের ভূমিহীনদের গ্রাম সংগঠনে সংগঠিত করা। এ সংস্থার কার্যাবলীকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

১। প্রতিষ্ঠান গড়া

২। সেক্টার কর্মসূচি

৩। ঋণ কর্মসূচি

৪। সহায়তা সার্ভিস।

প্রশিকা

প্রশিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৬ সালে। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীব মানুষদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা।

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন

এনজিও উদ্যোগ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে ১৯৯০ সালে পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে গরীব মানুষকে সহায়তা করা। এ সংস্থাটি প্রধানত ঋণ প্রদান করে থাকে; তবে সরাসরি নয়। অন্য কোন অংশীদার সংস্থার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দরিদ্র মানুষকে ঋণ দিয়ে থাকে[১১]।

৩.৩.১১ উপসংহার

এদেশে স্থানীয় সরকারের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বৃটিশ আগমনের আগেও এ উপমহাদেশে স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বৃটিশ আগমনের পর এদেশে ইউরোপীয় ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসনের সময় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে এ বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৮৭০ সালের আইনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে চৌকিদারী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৫ সালের আইনে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তরগুলি ছিল ইউনিয়ন কমিটি, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক বোর্ড। ১৯১৯ সালের আইনে এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। এ আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামের মানুষের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

---

[১১] A Review of Bangladesh's Development 1995, Centre for Policy Dialogue, UPL, Dhaka, 1995, *p.* 432.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এ আইনে জেলা পর্যায়ে ডিস্ট্রিক কাউন্সিল থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইনের সর্ব প্রথম থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের একটি স্তর সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বিভিন্ন সরকারের সময় স্থানীয় সরকার কাঠামোর বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার হিসেবে কাজ করছে।

এ অধ্যায়ের ২য় অংশে পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার জমিদারী প্রথা চালূ করে। এ ব্যবস্থায় প্রজার কোন অধিকার ছিল না। এর পরবর্তী সময়ে পল্লীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখে। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বাংলার পল্লীর উন্নয়নের চেষ্টা করেন। পল্লী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর। গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প বিকাশ কর্মসূচি এবং কুমিল্লা মডেল পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে গৃহীত বড় উদ্যোগ। পরবর্তী সময়ে সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
গবেষণা এলাকা

৪.১ ভূমিকা

এ অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণার জন্য যে এলাকা বাছা হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা ও নেত্রকোনা জেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এ অধ্যায়ে এ তিনটি জেলা এবং জেলাগুলির অধীন চারটি ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

৪.২ গবেষণাধীন বিভিন্ন এলাকার বর্ণনা

এই অধ্যায়ে আমরা বর্তমান গবেষণার জন্য যে এলাকা বেছে নিয়েছিলাম সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

৪.৩ কুমিল্লা জেলা

রাজধানী ঢাকার পূব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কুমিল্লা একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা। অতীতে এ জেলা শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিল। এ অঞ্চল সমতটের অধীনে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সংযুক্ত ছিল। নবম শতাব্দীতে এ জেলা হরিকেলে রাজাদের অধীনে আসে। কুমিল্লা শহরের ৫ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণে লালমাই ময়নামতিতে দেব বংশ (অষ্টম শতাব্দী) ও চন্দ্র বংশের (দশম ও একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) রাজস্ব ছিল। এ জেলা ১৭৬৫ সালে সর্ব প্রথম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে আসে ১৯৭০ সালে ত্রিপুরা জেলা নামে এ জেলার সৃষ্টি। ১৯৬০ সালে এ জেলার নাম হয় কুমিল্লা জেলা। ১৯৮৪ সালে এ জেলার দু'টি মহকুমা চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আলাদা দু'টি জেলায় উন্নীত হয়। বর্তমান কুমিল্লা জেলায় উপজেলার সংখ্যা ১২টি, পৌরসভার সংখ্যা ৫টি, ইউনিয়নের সংখ্যা ১৭১টি।

কুমিল্লা জেলার আয়তন ৩০৮৫.১৭ বর্গ কিমি। উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নারায়নগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেণী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিতে মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২ সে এবং সর্বনিম্ন ১১.২ সে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৩৪ মিমি। প্রধান নদী ঃ মেঘনা, গোমতী, ডাকাতিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা

মোট জনসংখ্যা ৪০৩২৬৬৬। পুরুষ ৫০.৪৯%, ন ১৯ঢমহিলা ৪৯.৫১%। মুসলমান ৯৩.৮৫%, হিন্দু ৫.৯%, বোদ্ধ ০.১৩%, খ্রিষ্টান ০.০৩% এবং অন্যান্য ০.০৯%। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী কুমিল্লায় মঙ্গল জাতির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উপজাতি দেখা যায়। এরা 'টিপরা ও ঋষি' নামে পরিচিত।

ভূমি ব্যবহার

আবাদি জমি ২৪৩৫৯৬.৯৩ হেক্টর। এক ফসলি ১৮.০৫%, দো ফসলি ৬৩.৯৯%, তিন ফসলি ১৭.৯৬%। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ৩০%, ক্ষুদ্র চাষি ৪৬%, মধ্যম চাষি ২০%, বড় চাষি ৪%। প্রথম শ্রেণির আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ১৩৫০০ টাকা।

প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, সরিষা, গম, বেগুন। বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় ফসলাদি কাউন, চিনা, মিষ্টি আলু, তিল, তিসি। প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, কলা, পেয়ারা।

মৎস্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির খামার গবাদি পশু ২৮, মৎস্য ২৭, হ্যাচারি ৬৯, নার্চারী ২০০, হাঁস-মুরগি ১০৯।

যোগাযোগ ঃ পাকা রাস্তা ১২১৯ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৫৮৭ কিমি; রেলপথ ১০৮ কিমি।

কুমিল্লা সদর উপজেলা ঃ (কুমিল্লা জেলা) আয়তন ২৮০ বর্গ কিমি। উত্তরে বুড়িচং উপজেলা, দক্ষিনে লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলা। প্রধান নদীঃ গোমতী। রাজেন্দ্রপুর বনাঞ্চল, শালবন বিহার, লালমাই পাহাড় উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা শহর ১৮টি মৌজা ও ৬টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। আয়তন ১১.৪৭ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ১,৩৫,৩১৩; পুরুষ ৫৩.৪৭%, মহিলা ৪৬.৫৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ১১৭৯৭। শিক্ষার হার ৬০.৩%। উদ্যান ১, বোটনিক্যাল গার্ডেন ১, ডাকবাংলো ১।

প্রশাসন ঃ কুমিল্লা সদর থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৮৩ সালে। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ১৮, মহল্লা ৪১, ইউনিয়ন ১৯, মৌজা ৪৫২, গ্রাম ৪৫৮।

জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা ৫১৬৩১৯। পুরুষ ৫২.৯৭%, মহিলা ৪৭.৩%। মুসলমান ৯৩.৪২%, হিন্দু ৬.৩০%, বোদ্ধ ০.০৮%, খ্রিষ্টান ০.০৭%, অন্যান ০.১৩%।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৫৫%; পুরুষ ৬১.৪%, মহিলা ৪৭.৬%। কলেজ ১৭, হাইস্কুল ৮০, মক্তব ৬১৫, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৭, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৭, কারিগরী প্রতিষ্ঠান ১। সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান; কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ (১৮৯৯), কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালঅ (১৯১৪), নিবেদিতা প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৯), রামমালা ছাত্রাবাস (১৯১৬)।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৩০.৬৭%, কৃষি শ্রমিক ৮.০৬%, অকৃষি শ্রমিক ১.৯৪%, শিল্প ১.০২%, পরিবহন ৮.৯৬%, নির্মাণ ২.৬৩%, ব্যবসা ১৮.০৩%, চাকরি ১৮.৭২% এবং অন্যান্য ৯.৯৭%।

ভূমি ব্যবহার
মোট চাষযোগ্য জমি ২৭৯৭০.০৫ হেক্টর, আবাদি জমি ২১৪৭৩.৪৯ হেক্টর, পতিত জমি ৭২.৮৫ হেক্টর। এক ফসলি ২.৩৪%, দো ফসলী ৬৬.২৩%, তিন ফসলি ৩১.৪৩%। প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৬০০০০ টাকা। প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, বেন, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, তিল শাকসবজি। বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্ত প্রায় ফসলাদি ।ট, সূর্যমূখী, বাদাম, কাউন, তিসি, অড়হর। প্রধান ফল ফলাদি আম, নারিকেল, কলা কাঁঠাল।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ঃ পাকা রাস্তা ১০৯.৩৩ বর্গ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৩৫০.৯৩ বর্গ কিমি; রেলপথ ১৮ বর্গ কিমি, নদীপথ ১২ নটিক্যাল মাইল।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি। শিল্প ও কলকারখানাঃ জুলার কারখানা ১, কাপড়ের কল ১, পাটকল ১।

কুটির শিল্প ঃ কাঠের হস্তশিল্প ৭৫, পাটজাত দ্রব ৩৫, নকশিকাঁথা ১২, তাঁত ১৩।

হাটবাজার মেলা ঃ হাটবাজার ৩৮, উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ চকবাজার, রাজগঞ্জ, রাণীবাজার, নিউমার্কেট, শোয়াগাজী বাজার, বিজয়পুর বাজার, মেলা ৪; উল্লেখযোগ্য মেলা ঃ কুমিল্লা টাউন হল মেলা, রাণী বাজার মেলা, ভালীবাড়ী মেলা।

বিজয়পুর ইউনিয়ন ঃ কুমিল্লা সদর উপজেলায় অবস্থিত বিজয়পুর ইউনিয়ন একটি উন্নয়ন এলাকা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভাল। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এ ইউনিয়নে অবস্থিত। এ ইউনিয়নের এলাকার মধ্যেই রয়েছে ময়নামতির পত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ।

বিজয়পুর ইউনিয়নের আয়তন ১৯ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৫২ হাজার।

বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত মোট গ্রামের সংখ্যা ৪৮টি। নিম্নে ওয়ার্ডসহ গ্রামের তালিকা দেখানো হল ঃ

ওয়ার্ড নং ১ ঃ রাজারখোলা, পশ্চিম কাছাড়, শ্রীবিদ্যা, ভাংগামুড়া, বৈষ্ণবপুর, জামপুড়া।

ওয়ার্ড নং ২ ঃ মধ্যম বিজয়পুর, উত্তর বিজয়পুর, কালীপুর, ধনপুরা, নোয়াপাড়া, ধরণীবন্দ।

ওয়ার্ড নং ৩ ঃ লালমতি, হোসেনপুর, সুধন্যপুর, সানন্দা।

ওয়ার্ড নং ৪ ঃ সাওড়াতলী, হাড়াতলী, কৃষ্ণপুর, তুলাতলী, ঘোষগাঁও, সুলতানপুর, জয়পুর, রামনগর।

ওয়ার্ড নং ৫ ঃ সালশনুর, ফিরোজপুর, কোটবাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ড নং ৬ ঃ চাঙ্গিনী, মনিপুর, বাশবাড়ীয়া, নন্দনপুর, মোট পুস্কারনী, পশ্চিম বাশমারা, উত্তর বাশমারা, রামপুর।

ওয়ার্ড নং ৭ ঃ শাকতলা, দৈয়ারা, দাং মাঝিয়া।

ওয়াড নং ৮ ঃ উত্তর আশ্রাদপুর, মধ্যম আশ্রাদপুর, দক্ষিন আশ্রাদপুর, রামনগর, কচুয়া।

ওয়ার্ড নং ৯ ঃ উত্তর রামপুর, শ্রীভলবপুর, শ্রীমদপুর, লক্ষীপুর, দূর্গাপুর।

৪.৪ নেত্রকোনা জেলা

নেত্রকোনা জেলা অতীতে ময়নয়সিংহ জেলার একটি মহকুমা ছিল। ১৯৮২ সালে এই মহকুমাটি জেলায় রূপান্তরিত হয়। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রাও কিছুটা আলাদা। সব মিলিয়ে এ জেলাটি দেশের অন্য জেলাগুলি থেকে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

নেত্রকোনা জেলার আয়তন ২৮১০.৪০ বর্গ কিমি। উত্তরে মেঘালয়ের গারো পাহাড় (ভারত), দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্র ৩৩.৩° সে. এবং সর্ব নিম্ন ১২° সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৭৪ মিমি। প্রধান নদী ঃ সোসেশ্বরী, কংস, মগরা, ধুন, ধলা, তেত্তরখালী।

প্রশাসন ঃ নেত্রকোনা মহকুমা সৃষ্টি হয় ১৮৮২ সালে এবং মহকুমাকে জেলায় রুপান্ত করা হয় ১৯৮৪ সালে। উপজেলা ১০, পৌরসভা ৪, ওয়ার্ড ৩৬, মহল্লা ১০২, ইউনিয়ন ৮৫, গ্রাম ২২৮১।

উপজেলাসমূহ ঃ আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা সদর ও পূর্বধলা।

পৌরসভা ঃ বারহাট্টা, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা সদর।

জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা ঃ ১৯৩৭৭৯৪; পুরুষ ৫০.৭১%, মহিলা ৪৯.২৯%। মুসলমান ৮৩%, হিন্দু ১৪%, অন্যান্য ৩%।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার হার ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২৬%; পুরুষ ৩১.২%, মহিলা ২০.৪%। সরকারি মহাবিদ্যালয় ২, বেসরকারি মহাবিদ্যালয় ১৭, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০৬, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৪, মাদ্রাসা ৭৭, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩৪, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৭৮, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ২, আইন মহাবিদ্যালয় ১, নার্সিং ইনস্টিটিউট ১, সংস্কৃত কলেজ ১, হোমিওপ্যাথ কলেজ ১, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১, সংগীত বিদ্যালয় ২।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৫২.০৫%, মৎস্য ১.৮৭%, কৃষি শ্রমিক ২১.৯৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.০৯%, ব্যবসা ৭.৬১%, চাকরি ২.৯৪%, অন্যান্য ১০.৪৭%।

ভূমি ব্যবহার

চাষযোগ্য জমি ২০৭৬০৮.২৬ হেক্টর; পতিত জমি ১৫৭০২.১৪ হেক্টর। এক ফসলি ২৯.৫%, দো ফসলি ৫৫%, তিন ফসলি ১৫.৫%; সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৫%, ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ২২.২৩%, প্রান্তিক চাষি ২৯.৮৭%, ক্ষুদ্র চাষি ২৪.৩৫%, মধ্যম চাষি ১৭.৬৭%, বড় চাষি ৫.৮৮%, প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৫০০০ টাকা। প্রধান প্রাধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, সরিষা, আলু। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি আউস ধান, মিষ্টি আলু, ডাল। প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম্বুরা, কাঁঠাল, লেবু, কলা, পেঁপে, তাল, নারিকেল, বেল।

মৎস্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির খামার গবাদি পশু ১০২, হাঁস-মুরগি ৯১২, হ্যাচারি ৪।

যোগাযোগ ঃ পাকা রাস্তা ১৫৫ কিমি, আধাপাকা রাস্তা ৭৫ কিম, কাঁচা রাস্তা ৩০৩ কিমি, রেলপথ ৬৬ কিমি, নদীপথ ১৭৪ নর্টিক্যাল মাইল।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন হাতি, পাল্কি, কেয়ারা নৌকা, গরুর গাড়ী।

কুটির শিল্প ঃ বিড়ি শিল্প, বাঁশ, স'মিল, বেত ও মাটির কাজ, বরফকল, তেলকল ইত্যাদি।

হাট বাজার, মেলা ঃ হাট বাজার ১০৮, মেলা ৮, প্রধান রপ্তানি দ্রব ঃ মাছ, চামড়া, ডিম।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কার্যক্রম ঃ কেয়ার, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, কনসার্ন বাংলাদেশ, স্বাবলম্বী, নারী প্রগতি সংঘ, এসসিআই।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ আধুনিক হাসপাতাল ১, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১০, মাতৃসদন ও হাসপাতাল ১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪৮, কুষ্ঠ ও টিবি হাসপাতাল ১, কুষ্ঠ ও টিবি ক্লিনিক ১০, চক্ষু হাসপাতাল ১, ডায়াবেটিক হাসপাতাল ১, রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ১, হার্ট ফাউণ্ডেশন ১, পারিবারিক স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক ১, নার্সিম হোম ১, মিশন হাসপাতাল ১, দুঃস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১।

নেত্রকোনা সদর উপজেলা ঃ নেত্রকোনা সদর জেলার আয়তন ৩৪০.৩৫ বর্গ কিমি। উত্তরে দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) ও কলমাকান্দা উপজেলা, দক্ষিনে কেন্দুয়া ও গৌরীপুর উপজেলা, পূর্বে বারহাট্টা ও আটপাড়া উপজেলা, পশ্চিমে পূর্বধলা উপজেলা। প্রধান নদী ঃ কংস, ধলা, মগড়া, তেওরখালী।

উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ৩৩টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৩.৬৩ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ৫৩৮৫৩; পুরুষ ৫১.২২%, মহিলা ৪৭.৭৮%, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ৩৯৫১ জন। শিক্ষার হার ৫৪.২%, ডাকবাংলো ২।

প্রশাসন ঃ নেত্রকোনা থানা সৃষ্টি হয় ১৮৭৪ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ১৩, মৌজা ৩০৬, গ্রাম ৩৪৪।

জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা ২৬৫৬৪৩। পুরুষ ৫১.৩৬%, মহিলা ৪৮.৬৪%, মুসলমান ৮৯.৩২%, হিন্দু ১০.৩৬%, অন্যান্য ০.৩৫%।

শিক্ষার হার ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গড় হার ২৮.৪%, পুরুষ ৩৪%, মহিলা ২৩%। কলেজ ৪, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৪, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৭, স্যাটেলাইট ৪, এনজিও ১০১, মাদ্রাসা ৩৫, হোমিও কলেজ ১, ল কলেজ১, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ১, প্রাথমিক শিক্ষন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২, কিন্ডার গার্টেন ৮, পরিক্ষণ বিদ্যালয় ১।

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৪৬.৬৫%, পরিবহণ ১.৯৬%, মৎস্য ১.৭৬%, কৃষি শ্রমিক ১৮.৭৫%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৩৮%, ব্যবসা ১০.৩৫%, চাকরি ৫.৫৮%, অন্যান্য ১১.৫৭%।

ভূমি ব্যববহার

চাষযোগ্য জমি ৩৩৫৮৬.৪০ হেক্টর, পতিত জমি ১৭৫৪.৩৫ হেক্টর, এক ফসলি ৮%, দো-ফসলি ৭২%, তিন ফসলি ২০%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৮৫%। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ২০%, ক্ষুদ্র চাষি ২২%, মধ্যম চাষি ৫৪%, বড় চাষি ৪%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.১৩ হেক্টর। প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৭৫০০ টাকা। প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, সরিষা ভুট্টা। বিলুপ্ত বা বিলপ্তপ্রায় ফসলাদি আলু ও বিভিন্ন জাতেব ডাল। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল জাম।

মৎস, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার ঃ মৎস ১৪, গবাদি পশু ৮, হাঁস-মুরগি ৩২।

যোগাযোগ ঃ পাকা রাস্তা ৮২.৬৩ কিমি, আধা পাকা ১১.১৫ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৫৬২ কিমি; রেলপথ ১৭.৬ কিমি; নৌপথ ১৫ নর্টিক্যাল মাইল।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ বরফ কল ৭, ফ্লাওয়ার মিল ৮, স'মিল ৪৫, প্রিন্টিং প্রেস ১২।

কুটির শিল্প ঃ স্বর্ণকার ৩২, কামার ২২, কুমার ১৯, কাঠের কাজ ৮২, সেলাই কাজ ২৩০, ওয়েল্ডিং ২২, বিড়ি ফ্যাক্টরি ২।

হাটবাজার, মেলা ঃ হাটবাজার ৬০, উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ ঠাকুরকুনা, চুচুয়া, হাটযলা, শিমুলকান্দি, চল্লিশা, দক্ষিন বিসিউরা, মদনপুর, লক্ষীপুর, আমতলা। মেলা ঃ পৌষ মেলা (হযরত শাহ সুলতান কমরুদ্দিন (রাঃ) এর মাজারে), বাউল মেলা (নেত্রকোনা শহর)।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিন বিশিউরা ইউনিয়ন ঃ নেত্রকোনা জেলার দক্ষিন বিসিউরা একটি অনুন্নত ইউনিয়ন। জেলা এবং উপজেলা সদরের সাথে দক্ষিন বিসিউরার যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ। অর্থনৈতিক দিক থেকেও ইউনিয়নটির অবস্থা ভাল নয়।

দক্ষিন বিসিউরা ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ৯ বর্গমাইল। ১৯৯১ সালের আমদশুমারী হিসেবে জনসংখ্যা ১৬৬৫২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫৩.৮২%, মহিলা ৪৬.১৭%।

দক্ষিন বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদের মোট গ্রামের সংখ্যা ২৩টি। নিম্নে ওয়ার্ডসহ গ্রামের তালিকা দেখানো হলঃ

ওয়ার্ড নং ১ ঃ দক্ষিন বিসিউরা

ওয়ার্ড নং ২ ঃ বরুলা

ওয়ার্ড নং ৩ ঃ বিশপেকজী, চিনারাটী, বড় নাদুরা, ছোট নাদুরা।

ওয়ার্ড নং ৪ ঃ বাশাটী, পাবিষাপুর, জয়পাশা।

ওয়ার্ড নং ৫ ঃ দুগিয়া, বিয়াবালী, সিমচাপুর।

ওয়ার্ড নং ৬ ঃ দাপুনিয়া, বিশহেনুচিয়া, কামারধার, গোপাল নগর।

ওয়ার্ড নং ৭ ঃ শ্রীপুর বালী, লামছড়ি, মহিষাটী

ওয়ার্ড নং ৮ ঃ পলামাটী, থলাপাড়।

ওয়ার্ড নং ৯ ঃ আধপুর, কামার উড়া।

৪.৫ ঢাকা জেলা

ঢাকা জেলা বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত। এ জেলায় কৃষির সাথে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে বহু আগে থেকে এবং ব্যবসা বাণিজ্যেরও ঘটেছে ব্যাপক প্রসার।

ঢাকা জেলার আয়তন ১৪৬৩.৬০ বর্গকিমি। উত্তরে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলা, দক্ষিনে মুন্সিগঞ্জ ও রাজবাড়ী জেলা, পূর্বে নারায়নগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে মানিকগঞ্জ জেলা। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্র ৩৬° সে.; সর্বনিম্ন ১২.৭° সে. আর বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ২৩৭৬ মিমি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা জেলা শহর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালে এটিকে টাউন কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭২ সালে টাউন কমিটি বিলুপ্ত করে পৌরসভায় রূপান্তর করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে একে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরকে সিটি কর্পোরেশন এ রূপান্তর করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ৭টি প্রধান থানা (ধানমন্ডি, কোতোয়ালী, মতিঝিল, রমনা, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর এবং তেজগাঁও) এবং ১২টি অপ্রধান থানা (গুলশান, লালবাগ, মীরপুর, সবুজবাগ, ক্যান্টনমেন্ট, ডেমরা, হাজারীবাগ, শ্যামপুর, বাড্ডা, কাফরুল, কামরাঙ্গীরচর ও খিলগাঁও), মহল্লা ৭২৫ ওয়ার্ড ১৩০ নিয়ে গঠিত।

আয়তন ৩০৪ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ৫৩৭৮০০০ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক ২০০০)। পুরুষ ৫৬.৬২%, মহিলা ৪৩.৭৮%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ১৭৬৯১ জন। শিক্ষার হার ৬২.৩%।

প্রশাসন ঃ ঢাকা জেলা সৃষ্টি ১৭৭২ সালে। উপজেলা ৫, থানা ২১, পৌরসভা ৩, ওয়ার্ড ১৪৮, মহল্লা ৮২৪, ইউনিয়ন ৭৭, মৌজা ১০২০, গ্রাম ১৮৬৩।

উপজেলাসমূহ ঃ দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার, ধামরাই।

জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা ৮৫৭৫৫৩৩। পুরুষ ৫১.১৪%, মহিলা ৪৪.৮৬%, মুসলমান ৯২.৭২%, হিন্দু ৬.০৫%, অন্যান্য ০.৭৮%।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ স্বায়ত্ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ৪, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫, সরকারি মেডিকেল কলেজ ৪, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ১১, কারিগরি প্রশিক্ষণ কলেজ ২, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ৩, সরকারি কলেজ ২৮, বেসরকারি কলেজ ৯৭, আইন কলেজ ৩, সরকারি হাইস্কুল ৫৫, বেসরকারি হাইস্কুল ৩১৫, জুনিয়র হাইস্কুল ২৪, মাদ্রাসা ১৬৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৯৯, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২৬, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১৮, এনজিও ও স্যাটেলাইট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৯, প্রাইমারি শিক্ষক ইনস্টিটিউট ৪, কিন্ডারগার্টেন ১৪৩।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি শ্রমিক ৭.৬২%, শিল্প ১.৮৭%, ব্যবসা ২৩.০৮%, চাকরি ৩১.৪৯%, বাড়ীভাড়া ২.২৩%, পরিবহণ ৮.৫৩%, নির্মাণ শ্রমিক ২.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৭১%, অন্যান্য ১৫.৩%।

ভূমি ব্যবহার
চাষযোগ্য জমি ১৭২৪৮ হেক্টর, পতিত জমি ২০৭ হেক্টর, ব্যবসা ও শিল্প এলাকা ১২৮৯০৫ হেক্টর। এক ফসলি ৩৬.৫%, দো ফসলি ৫১%, তিন ফসলি ১২.৫%, সেচের আওতায় আবাদি জমি ৬৪%. প্রথম শ্রেণীর াবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি বিশ হাজার থেকে ১২ লক্ষ টাকা।

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, আলু, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন, চিনাবাদাম, আদা, সুপারি, শাকসবজি, গম, আখ, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ আল কুমারী ধান, কৌলজী আউশ, তিল, তিসি, সরিষা, তুলা, পাট, কাউন, মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি।

প্রধান ফল-ফলাদি ঃ আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, জলপাই, কামরাঙ্গা, নারিকেল, কুল, পেয়ারা, তরমুজ।

মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির খামার ঃ মৎস্য ২৫৬, গবাদি পশু ২৮৫, হাঁস মুরগি ৪৮২।

যোগাযোগ ঃ পাকা রাস্তা ১০৬৩ কিমি, আধাপাকা রাস্তা ৩৪০ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৮৩৯ কিমি; রেলপথ ২০ কিমি।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান উৎস ঃ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, গাবতলী বাস টার্মিনাল ও মহাখালী বাস টার্মিনাল।

তেজগাঁও সার্কেল ঃ তেজগাঁও থানার বৈশিষ্ট হল এই থানায় এখনও সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ থানার বহুলাংশে তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল হিসেবে পরিচিত।

পূর্বে প্রত্যেকটি থানা একটি উন্নয়ন সার্কেল ছিল। এই সার্কেলের উন্নয়নের দায়িত্বে একজন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) নিযুক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে থানাগুলি উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে উপজেলাগুলিতে সার্কেল অফিসারের পরিবর্তে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তেজগাঁও থানার একটি অংশ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত হয়ে গেছে। বাকী যে অংশ এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকা রয়েছে সেগুলি নিয়ে তেজগাঁও সার্কেল গঠিত। তেজগাঁওই প্রশাসনিক ইউনিট রূপে একমাত্র সার্কেল হিসেবে দেশে কার্যকরী রয়েছে।

তেজগাঁও থানার উত্তরে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, দক্ষিনে কেরানীগঞ্জ, পূর্বে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ এবং পশ্চিমে ঢাকা মহানগরীর সিটি কর্পোরেশনের এলাকাসমূহ। পূর্বে তেজগাঁও থানা ভাওয়াল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। এ রাজার অধীন সমস্ত অঞ্চলেই কেরাণীগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনিক কাযক্রমের সুবিধার্থে কেরাণীগঞ্জ ও তেজগাঁও নামে এই দুই অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

তেজগাঁও সার্কেলের মোট জনসংখ্যা ১১,৯৬,৯৬৬ জন। আয়তন ৭৯.৩৮ বর্গমাইল। প্রতি বর্গকিমিতে জনসংখ্যা ৯৮৭১ জন।

তেজগাঁও সার্কেলে রয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা। আবাদী জমি ১২.২৭২ হেক্টর। এক ফসলি জমি ৯১১০ হেক্টর। দো ফসলি জমি ২৫৭৭ হেক্টর। তিন ফসলি জমি ৫৮৫ হেক্টর। মোট ফসলি জমির পরিমাণ ১৬০১৯ হেক্টর। পতিত জমি ৪২৭ হেক্টর। অনাবাদী জমি ৫৯২৯ হেক্টর বেং বনভূমি ২০ হেক্টর।

শিক্ষার হার ৪৫%, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫০টি, মাদ্রাসা ১০২টি, মহাবিদ্যালয় ১৪টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ২৯টি এবং শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ৯টি।

Dhaka University Institutional Repository

সাতারকুল ইউনিয়ন ঃ সাতারকুল তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। অতীতে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বর্তমানে রাস্তা এবং ব্রীজ নির্মিত হওয়ায় ঢাকা শহরের সাথে সাতারকুলের ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাতারকুল ইউনিয়নের আয়তন ১৮ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ২০০০০ জন।

সাতারকুল ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত মোট গ্রামের সংখ্যা ১২টি। নিম্নে ওয়ার্ডসহ গ্রামের তালিকা দেখানো হল ঃ

ওয়ার্ড নং ১ ঃ পুকুর পাড়া

ওয়ার্ড নং ২ ঃ দক্ষিন পাড়া

ওয়ার্ড নং ৩ ঃ তালতলা, পিঁপড়ার টেক

ওয়ার্ড নং ৪ ঃ ব্যাংকেরটেক, খালপাড়া

ওয়ার্ড নং ৫ ঃ উভয়পাড়

ওয়ার্ড নং ৬ ঃ মেরুলখোলা, পাঁচখোলা

ওয়ার্ড নং ৭ ঃ মাদারদিয়া

ওয়ার্ড নং ৮ ঃ পূর্ব পদরদিয়া

ওয়ার্ড নং ৯ ঃ পশ্চিম পদরদিয়া

ডুমনি ইউনিয়ন ঃ ডুমনী তেজগাঁও সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নটি গঠন করা হয়েছে বেরাইত ইউনিয়নের অংশ বিশেষ কেটে। পূর্বে ডুমনী বেরাইত ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড ছিল। সেকারণে ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব কোন অফিস বিল্ডিং নেই। বর্তমানে অস্থায়ী কার্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

ডুমনী ইউনিয়নের আয়তন ১৮ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ৩০০০০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত মোট সংখ্যা ২৪টি। নিম্নে ওয়ার্ডসহ গ্রামের তালিকা দেখানো হল ঃ

ওয়ার্ড নং ১ ঃ তলনা

ওয়ার্ড নং ২ ঃ ভেলনা, মুনজারটেক

ওয়ার্ড নং ৩ ঃ মস্কুট

ওয়ার্ড নং ৪ ঃ পাতিরা, ভুইয়াপাড়া, পশ্চিমপাড়া, জামিরা হাজীর বাড়ী

ওয়ার্ড নং ৫ ঃ ঋষিপাড়া, মধ্যপাড়া, টেম্পুস্ট্যান্ড

ওয়ার্ড নং ৬ ঃ মোড়ল পাড়া, কাফিলাটেক, সোনের টেক

ওয়ার্ড নং ৭ ঃ ডুমনী, টেকপাড়া, নয়াপাড়া, আহরপাড়া,

ওয়ার্ড নং ৮ ঃ বারদিয়ার টেক, খাইলের পাড়া, পশ্চিম পাড়া, হাজীপাড়া

ওয়ার্ড নং ৯ ঃ কাঁঠালদিয়া, আমদিয়া, বাইকদিয়া।

৪.৬ উপসংহার

এ অধ্যায়ে কুমিল্লা, নেত্রকোনা ও ঢাকা জেলা এবং জেলাগুলির চারটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়। কুমিল্লা জেলা বিশেষ করে কুমিল্লা সদর উপজেলা একটি সমৃদ্ধ এলাকা। এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। কৃষির উন্নতির ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগের দিক থেকেও এলাকাটি অত্যন্ত উন্নত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ার কারণে কৃষি পণ্য বাজারজাত করা এবং ছোট শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। এই কুমিল্লা সদর উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়।

নেত্রকোনা জেলার বিশেষ করে নেত্রকোনা সদর উপজেলার অর্থনৈতিক ও যোগাযোগের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত। এ এলাকায় ব্যাপকভাবে কৃষির উন্নতি ঘটেনি এবং ছোট ছোট শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। নেত্রকোনা সদর উপজেলার বিশেষ করে দক্ষিন বিশিউড়া ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহর রাজধানী হওয়ার কারণে ঢাকা জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ঢাকা জেলার তেঁজগাও সার্কেল শহরের পাশে হওয়া সত্ত্বেও কৃষি প্রধান এলাকা। তেঁজগাও সার্কেলের সাতারকুল ইউনিয়নে গার্মেন্টসসহ কিছু শিল্প কারখানার প্রসার ঘটলেও ডুমনি ইউনিয়ন একান্তই কৃষি নির্ভর। ডুমনি ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভাল নয়। অতি সম্প্রতি একটা পাঁকা রাস্তার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

৫.১ ভূমিকা

এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সারণিগুলির উপাত্তের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি-১ ঃ বয়স

বয়স	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
২৫-৩৪ বৎসর	১৭	২৬.৫৬
৩৫-৪৪ বৎসর	২৫	৩৯.০৬
৪৫-৫৪ বৎসর	১৪	২১.৮৭
৫৫-৬৪ বৎসর	৫	৭.৮১
৬৫ + বৎসর	৩	৪.৬৮
মোট	৬৪	১০০

১ নং সারণিতে এ গবেষণার উত্তরদাতাদের বয়স দেখানো হয়েছে। এ সারণিতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার বয়স ৩৫ থেকে ৪৪ বৎসরের মধ্যে। ৩৯.০৬% (২৫ জন) উত্তরদাতার বয়স ৩৫ থেকে ৪৪ বৎসরের মধ্যে। এরপরই দেখা যায় ২৫ থেকে ৩৪ বৎসরের সীমা। ২৬.৫৬% (১৭ জন) উত্তরদাতার বয়স ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। ২১.৮৭% (১৪ জন) উত্তরদাতার বয়স ৪৫ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে। ৫৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সের উত্তরদাতারা যথাক্রমে ৭.৮১% (৫ জন) ও ৪.৬৮% (৩ জন)। এ সারণিতে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে যুবক বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যাই বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২ ঃ পদবী

পদবী	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
ইউ.পি চেয়ারম্যান	৪	৬.২৫
ইউ.পি মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত)	৪	৬.২৫
ইউ.পি সদস্য	১৬	২৫
মাতবর	৪০	৬২.৫
মোট	৬৪	১০০

২ নং সারণিতে উত্তরদাতাদের পদবী দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬.২৫% (৪ জন) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ৬.২৫% (৪ জন) ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং ২৫% (১৬ জন) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। ৬২.৫% (৪০ জন) উত্তরদাতা মাতবর বা সমাজ নেতা।

সারণি-৩ ঃ প্রধান পেশা

পেশা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
কৃষি	২০	৩১.২৫
ব্যবসা	২৫	৩৯.০৬
চাকুরী	৬	৯.৩৮
পেশাজীবী	৮	১২.৫০
অন্যান্য	৫	৭.৮১
মোট	৬৪	১০০

উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা দেখানো হয়েছে ৩ নং সারণিতে। এ সারণিতে দেখা যায় ব্যবসা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার প্রধান পেশা। ৩৯.০৬% (২৫ জন) উত্তরদাতার প্রধান পেশা হচ্ছে ব্যবসা। পেশার ক্ষেত্রে এরপর দেখা যায় কৃষির স্থান। ৩১.২৫% (২০ জন) উত্তরদাতার প্রধান পেশা কৃষি। ৯.৩৮% (৬ জন) উত্তরদাতার প্রধান পেশা চাকুরী। ১২.৫০% (৮ জন) উত্তরদাতা পেশাজীবী এবং অন্যান্য পেশার উত্তরদাতা ৭.৮১% (৫ জন)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪ ঃ অপ্রধান পেশা

পেশার নাম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
কৃষি	২৬	৪০.৬২
ব্যবসা	৭	১০.৯৩
চাকুরী (খণ্ডকালীন)	২	৩.১২
নাই	২৯	৪৫.৩১
মোট	৬৪	১০০

৪ নং সারণিতে উত্তরদাতাদের অপ্রধান পেশা উল্লেখিত হয়েছে। এ সারণিতে দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তরদাতার অপ্রধান কোন পেশা নেই। ৪৫.৩১% (২৯ জন) উত্তরদাতা তাদের কোন অপ্রধান পেশা নেই বলে জানিয়েছেন। ৪০.৬২% (২৬ জন) উত্তরদাতার অপ্রধান পেশা কৃষি। ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতার অপ্রধান পেশা ব্যবসা ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতার অপ্রধান পেশা খন্ডকালীন চাকুরী।

সারণি- ৫ ঃ বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থার ধরন	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৬০	৯৩.৭৫
অবিবাহিত	৩	৪.৬৮
বিধবা	১	১.৫৬
মোট	৬৪	১০০

৫ নং সারণিতে উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা দেখানো হয়েছে। এই সারণিতে দেখা যায়, ৯৩.৭৫% (৬০ জন) উত্তরদাতা বিবাহিত। ৪.৬৮% (৩ জন) উত্তরদাতা অবিবাহিত এবং ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা বিধবা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৬ ঃ সন্তান সংখ্যা

সন্তান	সংখ্যা (n = ৬১)	শতকরা হার (%)
১ জন	৯	১৪.৭৫
২ জন	১৬	২৬.২২
৩ জন	১২	১৯.৬৭
৪ জন	১০	১৬.৩৯
৫ জন	৫	৮.১৯
৬ জন	৩	৪.৯১
৭ জন	৪	৬.৫৫
বিবাহিত কিন্তু সন্তান নেই	২	৩.২৭
মোট	৬১	১০০

বিঃ দ্রঃ শুধুমাত্র ৬১ জন বিবাহিত উত্তরদাতা এই সারণিতে অন্তর্ভুক্ত ।

৬ নং সারণিতে ৬১ জন বিবাহিত উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এ সারণিতে ৩ জন অবিবাহিত উত্তরদাতা অন্তর্ভুক্ত নয়। সারণিতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা ২ জন। ২৬.২২% (১৬ জন) উত্তরদাতার ২ জন সন্তান হয়েছে। এরপর দেখা যায় ১৯.৬৭% (১২ জন) উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা ৩ জন। ১৬.৩৯% (১০ জন) উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা ৪ জন। ১৪.৭৫% (৯ জন) উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা ১ জন। ৮.১৯% (৫ জন), ৬.৫৫% (৪ জন), ৪.৯১% (৩ জন) উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৭,৬ জন। ৩.২৭% (২ জন) উত্তরদাতা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন সন্তান নাই।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৭ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	৯	১৪.০৬
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	৫	৭.৮১
ষষ্ঠ শ্রেণি - দশম শ্রেণি	১৮	২৮.১২
এস,এস,সি	১১	১৭.১৮
এইচ,এস,সি	১৪	২১.৮৭
স্নাতক	৭	১০.৯৩
মোট	৬৪	১০০

সারণি-৭ এ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে দেখা যায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা পড়া করেছেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক, এদের সংখ্যা ২৮.১২% (১৮ জন)। এরপর দেখা যায় এইচ,এস,সি পাশের সংখ্যা। ২১.৮৭% (১৪ জন) উত্তরদাতা এইচ,এস,সি পাশ। ১৭.১৮% (১১ জন) উত্তরদাতা এস,এস,সি পাশ। ১৪.০৬% (৯ জন) উত্তরদাতার সাক্ষরজ্ঞান রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রী রয়েছে ১০.৯৩% (৭ জন) ভাগের। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ৭.৮১% (৫ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-৮ ঃ বাৎসরিক আয়

আয়ের পরিমাণ (টাকা)	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
২৫,০০১ টাকার নীচে	৬	৯.৩৭
২৫,০০১-৫০,০০০ টাকা	১৩	২০.৩১
৫০,০০১- ৭৫,০০০ টাকা	১২	১৮.৭৫
৭৫,০০১-১,০০,০০০ টাকা	২০	৩১.২৫
১,০০,০০১-১,২৫,০০০ টাকা	৪	৬.২৫
১,২৫,০০১- ১,৫০,০০০ টাকা	৩	৪.৬৮
১,৫০,০০১-২,০০,০০০ টাকা	৩	৪.৬৮
২,০০,০০১- টাকা এবং এর উর্দ্ধে	৩	৪.৬৮
মোট	৬৪	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৮ নং সারণিতে উত্তরদাতাদের বাৎসরিক আয় দেখানো হয়েছে। এ সারণিতে দেখা যায় ৩১.২৫% (২০ জন) উত্তরদাতার বাৎসরিক আয় ৭৫,০০১ থেকে ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে। ২০.৩১% (১৩ জন) উত্তরদাতার বাৎসরিক আয় ২৫,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে। ১৮.৭৫% (১২ জন) উত্তরদাতার বাৎসরিক আয় ৫০,০০১ থেকে ৭৫,০০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে ২৫,০০১ টাকার নীচে বাৎসরিক আয় রয়েছে ৯.৩৭% (৬ জন) উত্তরদাতার। ৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতার বাৎসরিক আয় ১,০০,০০১ থেকে ১,২৫,০০০ টাকা। ১,২৫,০০১ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা, ১,৫০,০০১ থেকে ২,০০,০০০ টাকা এবং ২,০০,০০১ টাকা এবং এর উর্দ্ধে; এই তিন ধরনের বাৎসরিক আয়ের মানুষ ৪.৬৮% (৪ জন) করে উত্তরদাতা।

সারণি - ৯ ঃ কৃষি জমির পরিমাণ

কৃষি জমি	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
০.০১-০.৫০ একর	২৩	৩৫.৯৩
০.৫১-১.০০ একর	১১	১৭.১৮
১.০১-১.৫০ একর	২	৩.১২
১.৫১-২.০০ একর	৯	১৪.০৬
২.০১-২.৫০ একর	২	৩.১২
২.৫১-৩.০০ একর	১১	১৭.১৮
৩.০১-৩.৫০ একর	১	১.৫৬
৩.৫১ একর এবং এর উর্দ্ধে	৫	৭.৮১
মোট	৬৪	১০০

৯ নং সারণিতে এ গবেষণার উত্তরদাতাদের কৃষি জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার কৃষি জমির পরিমাণ ০.০১ একর থেকে ০.৫০ একরের মধ্যে। ৩৫.৯৩% (২৩ জন) উত্তরদাতার কৃষি জমির পরিমাণ উপরোক্ত সীমার মধ্যে। এরপরেই দেখা যায়, কৃষি জমির পরিমাণ ০.৫১ থেকে ১.০০ একর এবং ২.৫১ থেকে ৩.০০ একর, এই দুটি সীমার প্রত্যেকটিকে ১৭.১৮% (১১ জন) করে উত্তরদাতা নিজেদের কৃষি জমির পরিমাণ বলে জানিয়েছেন। ১৪.০৬% (৯ জন) উত্তরদাতা নিজেদের কৃষি জমির পরিমাণ উল্লেখ করেছেন ১.৫১ একর থেকে ২.০০ একর এর মধ্যে। ৭.৮১% (৫ জন) উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন তাদের কৃষি জমির পরিমাণ ৩.৫১ একর এবং এর উর্দ্ধে। ১.০১ থেকে ১.৫০ একর এবং ২.০১ থেকে ২.৫০ একর এই দুটি সীমার প্রত্যেকটিকে ৩.১২% (২ জন) করে উত্তরদাতা নিজেদের কৃষি জমির পরিমাণ বলে উল্লেখ করেছেন। ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের কৃষি জমির পরিমাণ ৩.০১ থেকে ৩.৫০ একর এর মধ্যে।

সারণি-১০ ঃ বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ

বসত বাড়ীর জমি	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
০.০১-০.১৩ একর	১৭	২৬.৫৬
০.১৪-০.২৬ একর	৩২	৫০.০০
০.২৭-০.৩৯ একর	৮	১২.৫
০.৪০-০.৫২ একর	৪	৬.২৫
০.৫৩-০.৬৫ একর	-	-
০.৬৬-০.৭৮ একর	-	-
০.৭৯-০.৯১ একর	-	-
০.৯২ একর এবং এর উর্দ্ধে	৩	৪.৬৮
মোট	৬৪	১০০

এ গবেষণার উত্তরদাতাদের বসতবাড়ীর জমির পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে ১০ নং সারণিতে। এ সারণিতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ ০.১৪ একর থেকে ০.২৬ একর এর মধ্যে। ৫০% (৩২ জন) উত্তরদাতার বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ উপরোক্ত সীমার মধ্যে। এরপরেই দেখা যায় ২৬.৫৬% (১৭ জন) উত্তরদাতা নিজেদের বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ উল্লেখ করেছেন ০.০১ একর থেকে ০.১৩ একরের মধ্যে। বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ ০.২৭ একর থেকে ০.৩৯ একরের মধ্যে জানিয়েছেন ১২.৫% (৮ জন) উত্তরদাতা। ৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতা বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ বলেছেন ০.৪০ একর থেকে ০.৫২ একরের মধ্যে। ৪.৬৮% (৩ জন) উত্তরদাতা তাদের বসত বাড়ীর জমির পরিমাণ ০.৯২ একর এবং এর উর্দ্ধে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ উপসংহার

এ অধ্যায় থেকে উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে যে সমস্ত উপাত্তের সারণি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে বয়স, পদবী, প্রধান পেশা, অপ্রধান পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, সন্তান সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাৎসরিক আয়, কৃষি জমির পরিমাণ, বসতবাড়ীর জমির পরিমাণ সংক্রান্ত।

এ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরদাতাদের বয়স। দেখা যায় ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুন। সবচেয়ে বেশি (৩৯.০৬%) উত্তরদাতার বয়স ৩৫ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে। ৫৪ বছরের বেশি উত্তরদাতার সংখ্যা খুবই কম। এ উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত তরুনদের হাতে।

আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় অধিকাংশ উত্তরদাতার কৃষি জমির পরিমাণ বেশি নয়। সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতার (৩৫.৯৩%) কৃষি জমির পরিমাণ ০.০১ থেকে ০.৫০ একরের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

৬.১ ভূমিকা

এ অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে চেয়ারম্যান, সদস্যরা যে দায়িত্ব পালন করে এবং পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ যে ভূমিকা পালন করে সে সংক্রান্ত উপাত্তের সারণিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। এ সারণিগুলির উপাত্তের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ যে বাধার সম্মুখীন হয়, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে চেয়ারম্যান, সদস্যরা যে দায়িত্ব পালন করে, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

৬.২ ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পদ্ধতি ও চেয়ারম্যান, সদস্যদের ভূমিকা

সারণি-১১ ঃ পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব

দায়িত্ব/কাজ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
অবকাঠামো উন্নয়ন	৬০	৯৩.৭৫
আইন শৃংখলা রক্ষা	১০	১৫.৬২
দূর্যোগের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ	১১	১৭.১৮
গরীবদের সাহায্য	৩৮	৫৯.৩৭
স্বাস্থ্য,স্যানিটেশন,পরিবার কল্যাণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন	৬	৯.৩৭
গ্রামের বিচার সালিশ করা	২৭	৪২.১৮
বৃক্ষ রোপণ	৬	৯.৩৭
শিক্ষার উন্নয়ন	১১	১৭.১৮
সার্টিফিকেট প্রদান	৭	১০.৯৩
কৃষি উন্নয়ন	১	১.৫৬
গ্রামের লোকদের ঋণ পেতে সাহায্য করা	১	১.৫৬
খাল খনন করা	৩	৪.৬৮
হাট বাজার ডাক	১	১.৫৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	২	৩.১২
পানীয় জল সরবরাহ	৫	৭.৮১

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কি দায়িত্ব পালন করে থাকে এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত ১১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরদাতারা একের অধিক মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সারণিতে দেখা যায়, অবকাঠামো উন্নয়নকে বেশির ভাগ উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ৯৩.৭৫% (৬০ জন) উত্তরদাতার মতে অবকাঠামো উন্নয়ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কর্তব্য। উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী এরপর দেখা যায় গরীবদের সাহায্য করার বিষয়টি। ৫৯.৩৭% (৩৮ জন) উত্তরদাতার মতে গরীবদের সাহায্য করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব। ৪২.১৮% (২৭ জন) উত্তরদাতা মনে করেন, গ্রামের বিচার শালিস করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। দূর্যোগের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং শিক্ষার উন্নয়ন এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হিসাবে মনে করেন ১৭.১৮% (১১ জন) করে উত্তরদাতা। ১৫.৬২% (১০ জন) উত্তরদাতা আইন শৃংখলা রক্ষাকে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সার্টিফিকেট প্রদান ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতা। স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবার কল্যাণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং বৃক্ষ রোপণ করা এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ইউ,পি'র কর্তব্য মনে করেন ৯.৩৭% (৬ জন) করে উত্তরদাতা। পানীয় জল সরবরাহ, খাল খনন করা এবং আর্থ-সামাজিক উনয়নকে যথাক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব মনে করেন ৭.৮১% (৫ জন), ৪.৬৮% (৩ জন), ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতা। কৃষি উন্নয়ন, গ্রামের লোকদের ঋণ পেতে সাহায্য করা এবং হাট-বাজার ডাক এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ইউ,পি'র দায়িত্ব হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেন ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-১২ ঃ ইউনিয়ন পরিষদে বিশেষ প্রকল্প আনার জন্য তদবীর

সহযোগিতা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
মন্ত্রী সাহেবের কাছে	৪৫	৭০.৩১
এম,পি সাহেবের কাছে	৪১	৬৪.০৬
জেলা প্রশাসকের কাছে	১	১.৫৬
ইউ,এন,ও সাহেবের কাছে	১৭	২৬.৫৬
মন্ত্রণালয়ে	৪	৬.২৫
দলীয় রাজনীতিবিদদের কাছে	৫	৭.৮১

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদে বিশেষ প্রকল্প আনার জন্য কার কাছে তদবীর করতে হয় এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে ১২ নং সারণিতে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য। সারণিতে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতাই বিশেষ প্রকল্প আনার জন্য মন্ত্রী সাহেবের কাছে গিয়ে থাকেন।

৭০.৩১% (৪৫ জন) উত্তরদাতা বিশেষ প্রকল্প আনার জন্য মন্ত্রী সাহেবের কাছে তদবীর করেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে এম,পি সাহেবের সাহায্য প্রয়োজন হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৬৪.০৬% (৪১ জন) উত্তরদাতা। ২৬.৫৬% (১৭ জন) উত্তরদাতা মনে করেন ইউ,এন,ও'র সাহায্য এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। দলীয় রাজনীতিবিদ, মন্ত্রণালয়ের এবং জেলা প্রশাসকের কাছে তদবীরের প্রয়োজন হয় এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যথাক্রমে ৭.৮১% (৫ জন), ৬.২৫% (৪ জন) এবং ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-১৩ ঃ পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ইউ,পি'র বাধাসমূহ

বাধাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
জনসাধারণের অসহযোগিতা	৯	১৪.০৬
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাজের প্রতি কমিটমেন্টের অভাব	৪	৬.২৫
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব	৪	৬.২৫
উপজেলা পর্যায়ের কারিগরী কমকর্তা/কর্মচারীদের অসহযোগিতা	২	৩.১২
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব	৬	৯.৩৭
রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর প্রভাব	২	৩.১২
সম্পদের অভাব	৬১	৯৫.৩১
এম,পি সাহেবের প্রভাব	১	১.৫৬
অন্য বাধা তেমন নাই	৩	৪.৬৮
সরকারি কর্মচারীদের অসাধুতা	২	৩.১২
চেয়ারম্যানের অদক্ষতা	১	১.৫৬
সদস্যদের অদক্ষতা	৩	৪.৬৮
চেয়ারম্যানের অসাধুতা	৮	১২.৫
সদস্যদের অসাধুতা	৪	৬.২৫
ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি দপ্তরের সংগে সমন্বয়হীনতা	৩	৪.৬৮

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ) জন্য ইউ,পি যে সব বাধার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে ১৩ নং সারণি। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা একের অধিক উত্তর দিয়েছেন। সারণিতে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা সম্পদের অভাবকে অবকাঠামো নির্মাণে ইউ,পির প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৯৫.৩১% (৬১ জন) উত্তরদাতা, সম্পদের অভাবকে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ,পির অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জনসাধারণের অসহযোগিতা, চেয়ারম্যানের অসাধুতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব এই তিনটি বিষয়কে অবকাঠামো নির্মাণে ইউ,পির অন্যতম বাধা হিসেবে মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে ১৪.০৬% (৯ জন), ১২.৫% (৮ জন) এবং ৯.৩৭% (৬ জন) উত্তরদাতা।

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাজের প্রতি কমিটমেন্টের অভাব, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব এবং সদস্যদের অসাধুতা এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ইউ,পির অন্তরায় হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন ৬.২৫% (৪ জন) করে উত্তরদাতা। ৪.৬৮% (৩ জন) উত্তরদাতা ইউ,পির অবকাঠামো নির্মাণে অন্য বাধা তেমন নেই এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। সদস্যদের অদক্ষতা এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি দপ্তরের সংগে সমন্বয়হীনতা এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে অবকাঠামো নির্মাণে ইউ,পির বাধা হিসেবে বলেছেন ৪.৬৮% (৩ জন) করে উত্তরদাতা।

উপজেলা পর্যায়ের কারিগরী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর প্রভাব এবং সরকারি কর্মচারীদের অসাধুতা এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ইউ,পির রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতা। এম,পি সাহেবের প্রভাব এবং চেয়ারম্যানের অদক্ষতা এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণে ইউ,পির বাধা হিসেবে অভিমত দিয়েছেন ১.৫৬% (১ জন) করে উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৪ ঃ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ,পি চেয়ারম্যানের ভূমিকা

ভূমিকাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
কাজের পরিকল্পনা করা	৪৬	৭১.৮৭
ইউনিয়ন পরিষদে কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৩৮	৫৯.৩৭
প্রকল্প গ্রহণের আগে জনগণের মতামত জানা	১৬	২৫.০০
কাজের তত্ত্বাবধান করা	৩৪	৫৩.১২
কাজের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাছে তদবীর করা	৭	১০.৯৩
জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা	১০	১৫.৬২
সদস্যদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা	৮	১২.৫
পরিষদের সভায় আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১৫	২৩.৪৩
প্রকল্প কমিটি গঠন করা	১২	১৮.৭৫

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

অবকাঠামো নির্মাণের (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ) ক্ষেত্রে ইউ,পি চেয়ারম্যান যে সব ভূমিকা পালন করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ১৪ নং সারণিতে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

৭১.৮৭% (৪৬ জন) উত্তরদাতা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ,পি, চেয়ারম্যানের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন কাজের পরিকল্পনা করাকে। ইউনিয়ন পরিষদে কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজের তত্ত্বাবধান করা এই দুইটি বিষয়কে রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণে ইউ,পি চেয়ারম্যানের অন্যতম দায়িত্ব বলেছেন যথাক্রমে ৫৯.৩৭% (৩৮ জন) এবং ৫৩.১২% (৩৪ জন) উত্তরদাতা। ২৫% (১৬ জন) উত্তরদাতা অবকাঠামো নির্মাণে চেয়ারম্যানের ভূমিকা হিসেবে বলেছেন প্রকল্প গ্রহণের আগে জনগণের মতামত জানাকে। পরিষদের সভায় আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প কমিটি গঠন করা এই দুইটি বিষয়কে অবকাঠামো নির্মানে ইউ,পি চেয়ারম্যানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ২৩.৪৩% (১৫ জন) এবং ১৮.৭৫% (১২ জন) উত্তরদাতা। জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, সদস্যদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং কাজের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছে তদবীর করা এই তিনটি বিষয়কে অবকাঠামো নির্মাণের (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণে) ক্ষেত্রে ইউ,পি চেয়ারম্যানের ভূমিকা হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন যথাক্রমে ১৫.৬২% (১০ জন), ১২.৫% (৮ জন), ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৫ ঃ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ,পি সদস্যদের ভূমিকা

ভূমিকাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
কাজের পরিকল্পনা করা	৯	১৪.০৬
ইউনিয়ন পরিষদে কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা	৩৩	৫১.৫৬
প্রকল্প গ্রহণের আগে জনগণের মতামত জানা	৯	১৪.০৬
কাজের তত্ত্বাবধান করা	৯	১৪.০৬
কাজের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের তদবীর করা	১	১.৫৬
জনসাধারণকে কাজে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা	১৯	২৯.৬৮
চেয়ারম্যানের কাজে সহযোগিতা করা	৩০	৪৬.৮৭
পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ	৩৫	৫৪.৬৮
কমিটির সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়া	২১	৩২.৮১

দ্রষ্টব্য ঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

অবকাঠামো নির্মাণের (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত) ক্ষেত্রে ইউ,পি সদস্যরা যে সব ভূমিকা পালন করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ১৫ নং সারণিতে। এই সারণিতে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

৫৪.৬৮% (৩৫ জন) উত্তরদাতা পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণকে ইউ,পি সদস্যদের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে মতামত দিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদে কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে ৫১.৫৬% (৩৩ জন) উত্তরদাতা ইউ,পি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলেছেন। এরপরেই দেখা যায় চেয়ারম্যানের কাজে সহযোগিতা করার বিষয়টি। ৪৬.৮৭% (৩০ জন) মনে করেন উপরোক্ত বিষয়টি ইউ,পি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ৩২.৮১% (২১ জন) উত্তরদাতা কমিটির সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়াকে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউ,পি সদস্যদের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২৯.৬৮% (১৯ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন জনসাধারণকে কাজে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ইউপি সদস্যরা এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করেন। প্রকল্প গ্রহণের আগে জনগণের মতামত জানা এবং কাজের তত্ত্বাবধান করা এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ১৪.০৬% (৯ জন) করে উত্তরদাতা বলেছেন ইউ,পি সদস্যদের অবকাঠামো নিমার্ণের ক্ষেত্রে ভূমিকা হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা ভূমিকা হিসেবে অভিমত দিয়েছেন কাজের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে তদবীর করাকে।

সারণি-১৬ ঃ পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির ভূমিকা বিষয়ে অবগতি

ভূমিকা/কার্যক্রম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৫	৩৯.০৬
না	৩৯	৬০.৯৩
মোট	৬৪	১০০

১৬ নং সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে পল্লীর হাট-বাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির কার্যক্রম বিষয়ে উত্তরদাতারা অবগত কিনা এই বিষয়টি।

সারণিতে দেখা যায় ৬০.৯৩% (৩৯ জন) উত্তরদাতা বলেছেন পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির ভূমিকা বিষয়ে উত্তরদাতারা অবগত নন। অপরদিকে ৩৯.০৬% (২৫ জন) উত্তরদাতা মন্তব্য করেছেন তারা এ বিষয়ে জানেন।

সারণি-১৭ ঃ পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির ভূমিকা

ভূমিকা	সংখ্যা (n = ২৫)	শতকরা হার (%)
হাট-বাজার ইজারা দেওয়া	২২	৮৮.০০
হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	১৬	৬৪.০০
হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ তত্ত্বাবধান	১২	৪৮.০০
উত্তর দেননি	১	৪.০০

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পি যেসব ভূমিকা পালন করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত উল্লেখিত হয়েছে ১৭ নং সারণিতে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য। সারণিতে দেখা যায়, হাটবাজার ইজারা দেয়া বিষয়টির শতকরা হার সবচেয়ে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

৮৮% (২২ জন) উত্তরদাতা পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির ভূমিকা হিসেবে মতামত দিয়েছেন হাট-বাজার ইজারা দেওয়াকে। সম্প্রতি সময়ে হাটবাজার ইজারা প্রদানের দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অর্পন করা হয়েছে। ৬৪% (১৬ জন) উত্তরদাতা ইউ,পির কাজ হিসেবে বলেছেন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করাকে। হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ তত্ত্বাবধানকে ৪৮% (১২ জন) উত্তরদাতা পল্লীর হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় ইউ,পির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৪% (১ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন উত্তর দেননি।

সারণি-১৮ ঃ হাট-বাজার থেকে লব্ধ আয়-ব্যয়ের খাত

ব্যয়ের খাত	সংখ্যা (n = ৪৩)	শতকরা হার (%)
সংস্থাপন খাতে	১৯	৪৪.১৮
রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ	১৬	৩৭.২০
জানা নেই	৬	১৩.৯৫
উত্তর দেননি	১০	২৩.২৫

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

হাটবাজার থেকে লব্ধ আয় ইউ,পি যে সব খাতে ব্যয় করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে ১৮ নং সারণি । এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর দেখানো হয়েছে।

৪৪.১৮% (১৯ জন) উত্তরদাতা হাটবাজার থেকে লব্ধ আয় ব্যয়ের খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সংস্থাপন খাতকে ।

৩৭.২০% (১৬ জন) উত্তরদাতা অবকাঠামো নির্মাণকে (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ) ব্যয়ের খাত হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন।

২৩.২৫% (১০ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন উত্তর দেননি।

এ প্রশ্নে উত্তর না দেওয়া সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রমাণ করে।

১৩.৯৫% (৬ জন) উত্তরদাতা বলেছেন ইউ,পির হাটবাজার থেকে লব্ধ আয় ব্যয়ের খাত সম্পর্কে উত্তরদাতারা জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৯ ঃ হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

কার্যক্রম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
রাখে	৮	১২.৫
কিছুটা রাখে	৩৪	৫৩.১২
রাখে না	৫	৭.৮১
উত্তর দেননি	১৭	২৬.৫৬
মোট	৬৪	১০০

হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে ১৯ নং সারণিতে।

৫৩.১২% (৩৪ জন) উত্তরদাতা বলেছেন হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কিছুটা রাখে। ২৬.৫৬% (১৭ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে উত্তর দেননি। ১২.৫% (৮ জন) মতামত দিয়েছেন হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে না এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৭.৮১% (৫ জন) উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২০ ঃ গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য ইউ,পি যে সব ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভূমিকা/কার্যক্রম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
ভি,জি,ডি কার্ড বিতরণ করে থাকে	৬১	৯৫.৩১
ডি,জি,এফ কার্ড বিতরণ করে থাকে	৩৯	৬০.৯৩
বয়স্ক ভাতা প্রদান	৩২	৫০.০০
বিধবা ভাতা প্রদান	১৪	২১.৮৭
দূর্যোগের সময় রিলিফ বিতরণ	৩২	৫০.০০
কাজের সুযোগ সৃষ্টি	১৬	২৫.০০
বিচার সালিশ করা	২৬	৪০.৬২

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য ইউ,পি যে সব ভূমিকা পালন করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে ২০ নং সারণিতে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতাই ভি,জি,ডি কার্ড বিতরণ করাকে গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য ইউ,পির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৯৫.৩১% (৬১ জন) মতামত দিয়েছেন ভি,জি,ডি কার্ড বিতরণ করাকে ইউ,পির প্রধান ভূমিকা হিসেবে। ৬০.৯৩% (৩৯ জন) উত্তরদাতা গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য ইউ,পির কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন ডি,জি,এফ কার্ড বিতরণ করাকে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান এবং দূর্যোগের সময় রিলিফ বিতরণ এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ইউ,পির অন্যতম কাজ হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন ৫০% (৩২ জন) করে উত্তরদাতা। ৪০.৬২% (২৬ জন) উত্তরদাতা ইউ,পির দায়িত্ব হিসেবে বলেছেন বিচার সালিশ করাকে। কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিধবা ভাতা প্রদান এই দুইটি বিষয়কে গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষের জন্য ইউ,পির ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে ২৫.০০% (১৬ জন) এবং ২১.৮৭% (১৪ জন) উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ২১ ঃ ইউ,পি যে সব কারণে গরীব দুঃখী মানুষকে যথেষ্ট সেবা দিতে পারে না

কারণসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য	৬০	৯৩.৭৫
পক্ষপাত করার কারণে	১১	১৭.১৮
রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে	১০	১৫.৬২
এলাকায় কোন্দলের কারণে	৩	৪.৬৮
এম.পি সাহেবের প্রভাবের কারণে	১	১.৫৬
ইউ,এন,ওর প্রভাবের কারণে	২	৩.১২
ইউ,পির দক্ষতার অভাবে	১	১.৫৬
চেয়ারম্যান সদস্যদের কোন্দলের কারণে	৩	৪.৬৮
চেয়ারম্যান সদস্যদের অসাধুতার কারণে	৩	৪.৬৮
কোন বাধা নাই	৫	৭.৮১

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

ইউ,পি গরীব দুঃখী মানুষকে যেসব কারণে যথেষ্ট সেবা দিতে পারে না এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ২১ নং সারণিতে। এ সারণিতে উত্তরদাতারা একের অধিক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সারণিতে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতাই এর কারণ হিসেবে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছেন। ৯৩.৭৫% (৬০ জন) উত্তরদাতার মতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্যই ইউ,পি দায়িত্ব যথেষ্ট পালন করতে পারছে না। যথেষ্ট সেবা দিতে না পারার কারণ হিসেবে এরপর দেখা যায় পক্ষপাত। ১৭.১৮% (১১ জন) উত্তরদাতা বলেন, পক্ষপাতের কারণে ইউনিয়ন পরিষদ গরীব দুঃখী মানুষকে যথেষ্ট সেবা দিতে পারে না। ১৫.৬২% (১০ জন) উত্তরদাতার মতে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ইউপি গরীব দুঃখীদের যথেষ্ট সাহায্য সেবা দিতে সক্ষম হয় না। ৭.৮১% (৫ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন বাধা নেই মনে করেন। ৪.৬৮% (৩ জন) এ বিষয়ে এলাকার কোন্দলকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৪.৬৮% (৩ জন) করে উত্তরদাতা চেয়ারম্যান সদস্যদের কোন্দলকে ও চেয়ারম্যান সদস্যদের অসাধুতাকে এবং এলাকার কোন্দলকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতা বলেন, ইউএনও'র প্রভাবের কারণে ইউপি গরীব

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখীদের পর্যাপ্ত সেবা দিতে পারে না। ১.৫৬% (১ জন) করে উত্তরদাতার মতে এম,পি সাহেবের প্রভাব ও ইউপি'র দক্ষতার অভাব এজন্য দায়ী।

সারণি-২২ ঃ ইউ,পির মহিলা সদস্যদের কাজের প্রকৃতি জানা

কাজের প্রকৃতি	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
জানি	৩২	৫০
জানি না	৩২	৫০
মোট	৬৪	১০০

২২ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে ইউ,পির মহিলা সদস্যদের কাজের প্রকৃতি জানার বিষয়টি।

৫০% (৩২ জন) উত্তরদাতা মনে করেন তারা ইউ,পির মহিলা সদস্যদের কাজের প্রকৃতি জানেন। অপরদিকে কাজের প্রকৃতি জানেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন বাকি ৫০% (৩২ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-২৩ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যে সার্কুলারের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা দেখা

দায়িত্ব	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪	৬.২৫
না	৬০	৯৩.৭৫
মোট	৬৪	১০০

স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যে সার্কুলারের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের উত্তর দেখানো হয়েছে ২৩ নং সারণিতে।

৯৩.৭৫% (৬০ জন) উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যে সার্কুলারের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা দেখেননি।

৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতা সার্কুলার দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৪ ঃ গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের জন্য ইউ,পি যা করে থাকে

কার্যক্রম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
ভি,জি,ডি কার্ড বিতরণ করে	৫৯	৯২.১৮
বয়স্ক ভাতা দেয়	১০	১৫.৬২
বিধবা ভাতা দেয়	৪৫	৭০.৩১
দূর্যোগের সময় রিলিফ দেয়	২৭	৪২.১৮
নারী নির্যাতন নিরোধে বিচার সালিশ করে	৩৯	৬০.৯৩
কাজের সুযোগ সৃষ্টি	৭	১০.৯৩

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের জন্য ইউ,পি যা করে থাকে সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ২৪ নং সারণিতে। এই বিষয়ে উত্তরদাতারা একের অধিক মতামত ব্যক্ত করেছেন। সারণি হতে দেখা যায়, ভিজিডি কার্ড বিতরণ করার বিষয়টির শতকরা হার সবার চেয়ে বেশি। ৯২.১৮% (৫৯ জন) উত্তরদাতার মতে গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের জন্য ইউ,পি ভি,জি,ডি বিতরণ কার্যক্রম করে থাকে। উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী এর পরেই রয়েছে বিধবা মহিলাদের ভাতা দেয়ার বিষয়টি। ৭০.৩১% (৪৫ জন) উত্তরদাতার মতে বিধবা ভাতা দেয়া ইউপি'র গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নারী নির্যাতন নিরোধে বিচার সালিশ করাও যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তা প্রকাশ পেয়েছে ৬০.৯৩% (৩৯ জন) উত্তরদাতাদের মতামতের প্রেক্ষিতে। ৪২.১৮% (২৭ জন) উত্তরদাতা বলেছেন দূর্যোগের সময় ইউ,পি রিলিফ বিতরণ করে থাকে। ১৫.৬২% (১০ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন বয়স্কদের ভাতা দেয়ার বিষয়টি। কাজের সুযোগ সৃষ্টি ইউ,পির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে মতামত দিয়েছেন ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-২৫ ঃ গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ইউ,পি মহিলা সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা

ভূমিকা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫০	৭৮.১২
না	১৪	২১.৮৭
মোট	৬৪	১০০

Dhaka University Institutional Repository

২৫ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ইউ,পির মহিলা সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা রাখার বিষয়টি।

৭৮.১২% (৫০ জন) উত্তরদাতা এক্ষেত্রে ইউ,পি মহিলা সদস্যরা বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যা ইউ,পির মহিলা সদস্যদের ভূমিকাকে ইতিবাচক হিসেবে চিহ্নিত করে।

অপরদিকে ২১.৮৭% (১৪ জন) মনে করেন ইউ,পির মহিলা সদস্যরা গ্রামের গরীব দুঃখীদের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন না।

সারণি-২৬ ঃ গরীব দুঃখী মহিলাদের ইউ,পির মহিলা সদস্যরা যে ধরনের সাহায্য করে

সাহায্যের ধরন	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
গরীব মহিলাদের ভিজিডি কার্ড পেতে সাহায্য করে	৪৮	৯৬
গরীব বিধবা মহিলাদের ভাতা পেতে সাহায্য করে	৩০	৬০
গরীব মহিলাদের গ্রাম আদালত/সালিশের বিচার পেতে সাহায্য করে	২৯	৫৮
গরীব দুঃখী মহিলাদের হাসপাতালে যেতে সাহায্য করে	৭	১৪
গরীব মহিলাদের দূর্যোগের সময় রিলিফ পেতে সাহায্য করে	১৮	৩৬
গরীব মহিলাদের আইন/আদালতের সাহায্য নিতে সহযোগিতা করে	৪	৮
এলাকায় নারী শিশু নির্যাতন নিরোধে ভূমিকা নিয়ে থাকে	১৬	৩২

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

গ্রামের গরীব দুঃখী মহিলাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ইউ,পির মহিলা সদস্যরা যে ধরনের সাহায্য করে থাকেন এই বিষয়ে উত্তরদাতারা যে মত প্রকাশ করেছেন তা দেখানো হয়েছে ২৬ নং সারণিতে। উত্তরদাতারা মতামত ব্যক্ত করেছেন একের অধিক।

401803

সারণিতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন গরীব মহিলাদের ভিজিডি কার্ড পেতে সাহায্য করাকে। ৯৬% (৪৮ জন) মনে করেন উপরোক্ত বিষয়টিই ইউপি মহিলা সদস্যদের প্রধান সাহায্যের বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬০% (৩০ জন) উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন গরীব বিধবা মহিলাদের ভাতা পেতে সাহায্য করাকে। গরীব মহিলাদের গ্রাম আদালত/সালিশের বিচার পেতে সাহায্য করাকে ৫৮% (২৯ জন) উত্তরদাতা ইউ,পি মহিলা সদস্যের অন্যতম ভূমিকা হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। ৩৬% (১৮ জন) অভিমত ব্যক্ত করেছেন গরীব মহিলাদের দূর্যোগের সময় রিলিফ পেতে সাহায্য করাকে। ৩২% (১৬ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন এলাকায় নারী শিশু নির্যাতন নিরোধে ইউ,পি মহিলা সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । গরীব দুঃখী মহিলাদের হাসপাতালে যেতে সাহায্য করা, গরীব মহিলাদের আইন/আদাতলের সাহায্য নিতে সহযোগিতা করা ইউ,পি মহিলাদের সাহায্য হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন যথাক্রমে ১৪% (৭ জন), ৮% (৪ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-২৭ ঃ মহিলা সদস্যরা কাজে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়

বাধাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সমাজের অসহযোগিতা	২৩	৩৫.৯৩
পারিবারিক বাধা	১৪	২১.৮৭
প্রশাসনিক বাধা	১	১.৫৬
চেয়ারম্যানের অসহযোগিতা	৪	৬.২৫
অন্যান্য সদস্যদের অসহযোগিতা	১	১.৫৬
নিজের অদক্ষতা	৫	৭.৮১
অভিজ্ঞতার অভাব	১৫	২৩.৪৩
কোন বাধা নাই	১২	১৮.৭৫

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

২৭ নং সারণিতে ইউ,পি মহিলা সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন সে বিষয়ে উত্তয়দাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতারা মতামত প্রকাশ করেছেন একের অধিক।

বেশির ভাগ উত্তরদাতা বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমাজের অসহযোগিতাকে। ৩৫.৯৩% (২৩ জন) উত্তরদাতা মনে করেন সমাজের অসহযোগিতাই ইউ,পি মহিলা সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে প্রধান বাধা। ২৩.৪৩% (১৫ জন) মতামত দিয়েছেন অভিজ্ঞতার অভাবে ইউ,পি মহিলা সদস্যরা কাজে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক বাধার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করছেন ২১.৮৭% (১৪ জন) উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের ১৮.৭৫% (১২ জন) বলেছেন ইউ,পির মহিলা সদস্যরা কোন বাধার সম্মুখীন হন না। নিজের অদক্ষতা এবং চেয়ারম্যানের অসহযোগিতার ফলেই ইউ,পি মহিলা সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে এই মত প্রকাশ করেছেন যথাক্রমে ৭.৮১% (৫ জন) এবং ৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতা। ১.৫৬% (১ জন) করে উত্তরদাতা প্রশাসনিক বাধা এবং অন্যান্য সদস্যদের অসহযোগিতাকে ইউ,পির মহিলা সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ পল্লী উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম

সারণি-২৮ ঃ কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের ইউ,পির সহায়তা

সহায়তা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৬	৫৬.২৫
না	২৮	৪৩.৭৫
মোট	৬৪	১০০

ইউ,পির কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের কোন সহায়তা করে থাকে কিনা এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ২৮ নং সারণিতে।

৫৬.২৫% (৩৬ জন) উত্তরদাতা মনে করেন ইউ,পি কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের সহায়তা করে থাকে। কৃষি উন্নয়নে ইউ,পি কৃষকদের কোনো সহায়তা করে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন ৪৩.৭৫% (২৮ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-২৯ ঃ কৃষি উন্নয়নে ইউ,পি কৃষকদের যে ধরনের সহায়তা করে থাকে।

সহায়তার ধরন	সংখ্যা (n = ৩৬)	শতকরা হার (%)
দূর্যোগ পরবর্তী সময় সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ	১৭	৪৭.২২
মাঝে মধ্যে সীমিতভাবে সার,বীজ সরবরাহ	১৭	৪৭.২২
গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করে থাকে	১	২.৭৭
ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের সহযোগিতা করে থাকে	৫	১৩.৮৮
খাল খনন করে কৃষি কাজের ব্যবস্থা করেছে	৩	৮.৩৩
গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠায় চেয়ারম্যান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে	২	৫.৫৫

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

কৃষি উন্নয়নে ইউ,পি কৃষকদের যে সব সহায়তা করে থাকে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে ২৯ নং সারণিতে। এই সারণিতে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দূর্যোগ পরবর্তী সময় সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ এবং মাঝে মধ্যে সীমিতভাবে সার, বীজ সরবরাহ এই দুই ধরনের সহায়তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ৪৭.২২% (১৭ জন) করে উত্তরদাতা।

উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী এরপর দেখা যায় ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের সহযোগিতার বিষয়টি। ১৩.৮৮% (৫ জন) মনে করেন ইউ,পি কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের এই সাহায্য করে থাকে।

৮.৩৩% (৩ জন) উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খাল খনন করে কৃষি কাজের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ইউ,পি কৃষকদের সহায়তা করে। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠায় ইউ,পি চেয়ারম্যানের উদ্যোগী ভূমিকা এবং গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনায় ইউ,পি সাহায্য করে এই দুইটি বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন যথাক্রমে ৫.৫৫% (২ জন) এবং ২.৭৭% (১ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-৩০ ঃ কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সম্পদের অভাব	৪৮	৭৫.০০
দক্ষ জনবলের অভাব	২	৩.১২
সরকারি কৃষি বিভাগের সাথে কাজের সমন্বয়ের অভাব	৭	১০.৯৩
ইউ,পির এ বিষয়ে উদ্যোগের অভাব	৮	১২.৫
সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক	৫	৭.৮১
মতামত দেননি	৫	৭.৮১

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩০ নং সারণিতে উত্তরদাতারা নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের সহায়তায় ইউ,পির সীমাবদ্ধতা নিয়ে। এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের একের অধিক মতামত প্রযোজ্য।

সম্পদের অভাবই কৃষকদের সহায়তায় ইউ,পির প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৭৫% (৪৮ জন) উত্তরদাতা। ১২.৫% (৮ জন) উত্তরদাতা কৃষকদের উন্নয়নে ইউপির বাধা হিসেবে দেখিয়েছেন ইউ,পির এ বিষয়ে উদ্যোগের অভাবকে। সরকারি কৃষি বিভাগের সাথে কাজের সমন্বয়ের অভাবকে কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের সহায়তায় ইউ,পির সীমাবদ্ধতা হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতা। ৭.৮১% (৫

Dhaka University Institutional Repository

জন) উত্তরদাতা বলেছেন সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক। ৭.৮১% (৫ জন) উত্তরদাতা এই বিষয়ে কোন মতামত দেননি। দক্ষ জনবলের অভাবও যে ইউ,পির সীমাবদ্ধতা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-৩১ ঃ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকাসমূহ

ভূমিকাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
টিউবওয়েল সরবরাহ	৫৮	৯০.৬২
বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	৩	৪.৬৮
জানেন না	৪	৬.২৫
সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী স্থান নির্বাচন করা	২	৩.১২

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ যে সব ভূমিকা পালন করে থাকে তা ৩১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এই সারণিতে একের অধিক উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

এই সারণিতে দেখা যায় যে, পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উত্তরদাতা টিউবওয়েল সরবরাহকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ৯০.৬২% (৫৮ জন) উত্তরদাতার মতে টিউবওয়েল সরবরাহই পানীয় জল সরবরাহের প্রধান মাধ্যম। ৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতা পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সম্পর্কে অবগত নন বলে মন্তব্য করেছেন।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী স্থান নির্বাচন করা এ বিষয় দুটিকে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে ৪.৬৮% (৩ জন) এবং ৩.১২% (২ জন) উত্তরদাতা।

সারণি- ৩২ ঃ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক কিনা

ভূমিকা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	-	-
না	৬৪	১০০
মোট	৬৪	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৩২ নং সারণিতে উত্তরদাতারা মতামত দিয়েছেন পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক কিনা, এই বিষয়ের উপর।

উত্তরদাতাদের সবাই অর্থাৎ ১০০% (৬৪ জন) মত প্রকাশ করেছেন যে, পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়।

সারণি-৩৩ ঃ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সন্তোষজনক না হওয়ার কারণসমূহ

কারণসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সম্পদের সীমাবদ্ধতা	৪৬	৭১.৮৭
টিউবওয়েল বসানোর জায়গা ঠিক করার জন্য যে কমিটি আছে তাকে গুরুত্ব না দেওয়া	১	১.৫৬
এম,পি সাহেবের প্রভাব	১	১.৫৬
কর্মকর্তাদের প্রভাব	১	১.৫৬
সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক	২২	৩৪.৩৭
এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা আছে	১	১.৫৬
গ্রামের দলাদলি	৪	৬.২৫
প্রভাবশালী মহলের প্রভাব	৪	৬.২৫

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে পানীয় জল সরবরহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক না হওয়ার কারণসমূহ। উত্তরদাতারা মতামতও দিয়েছেন একের অধিক।

বেশিরভাগ উত্তরদাতাই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে। ৭১.৮৭% (৪৬ জন) এর মতে সম্পদের সীমাবদ্ধতাই পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক না হওয়ার প্রধান কারণ।

৩৪.৩৭% (২২ জন) উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক, যার কারণে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা সন্তোষজনক হয় না। গ্রামের দলাদলি এবং প্রভাবশালী মহলের প্রভাব এই

Dhaka University Institutional Repository

দুইটি বিষয়কে ইউ,পির পানীয় জল সরবরাহের কাজ সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন ৬.২৫% (৪ জন) করে উত্তরদাতা।

টিউবওয়েল বসানোর জায়গা ঠিক করার জন্য যে কমিটি আছে তাকে গুরুত্ব না দেয়া, এম,পি সাহেবের প্রভাব, কর্মকর্তাদের প্রভাব, এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা আছে প্রতিটি বিষয়কে ইউ,পির পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভূমিকা সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ হিসেবে মতামত দিয়েছেন ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা।

সারণি-৩৪ ঃ সমবায়ের (বি,আর,ডি,বি পরিচালিত) সাথে ইউ,পির সম্পর্ক

সম্পর্ক	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৬	২৫
না	৪৮	৭৫
মোট	৬৪	১০০

৩৪ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে সমবায়ের (বি,আর,ডি,বি পরিচালিত) সাথে ইউ,পির সম্পর্ক থাকার বিষয়টি।

৭৫% (৪৮ জন) উত্তরদাতা মনে করেন সমবায়ের সাথে ইউ,পির কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে বাকী ২৫% (১৬ জন) উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন এদের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩৫ ঃ সমবায়ের (বি,আর,ডি,বি পরিচালিত) সাথে ইউ,পির সম্পর্কের ধরন

সম্পর্কের ধরণ	সংখ্যা (n = ১৬)	শতকরা হার (%)
প্রয়োজনে সমবায়কর্মীরা ইউ,পির সাহায্য নেয়	৬	৩৭.৫
অনেক সময় সমবায়ীদের কমিটির সদস্য করা হয় (যেমন ত্রাণ বিতরণের সময়)	১	৬.২৫
খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য সমবায় চেয়ারম্যানের কাছে আসেন	১	৬.২৫
বার্ডের কর্মকর্তারা এসে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সম্পর্কে ইউ,পির সাথে আলোচনা করে থাকে	২	১২.৫
সুষ্ঠুভাবে কাজে সম্পাদনের জন্য মাঝে মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ও সমবায়ীদের মধ্যে মিটিং হয়	১	৬.২৫
সাহায্যের জন্য সমবায়কর্মীরা চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ রাখেন	৫	৩১.২৫
মোট	১৬	১০০

সমবায়ের (বি,আর,ডি,বি পরিচালিত) সাথে ইউ,পির কি ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান, উত্তরদাতাদের এই বিষয়ের মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে ৩৫ নং সারণি।

৩৭.৫% (৬ জন) উত্তরদাতা মনে করেন, প্রয়োজনে সমবায় কর্মীরা ইউ,পির সাহায্য নেয়। ৩১.২৫% (৫ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, সাহায্যের জন্য সমবায় কর্মীরা চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

সমবায়ের সাথে ইউ,পির সম্পর্কের ধরন বোঝাতে ১২.৫% (২ জন) উত্তরদাতার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বার্ডের কর্মকর্তারা এসে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সম্পর্কে ইউ,পির সাথে আলোচনা করে থাকেন। এ ধরনের কর্ম উদ্যোগ কুমিল্লা সদর থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক সময় সমবায়ীদের কমিটির সদস্য করা হয় (যেমন ত্রাণ বিতরণের সময়), খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য সমবায় কর্মীরা চেয়ারম্যানের কাছে আসেন এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য মাঝে মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ও সমবায়ীদের মধ্যে মিটিং হয় এই ধরনের প্রত্যেকটি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন ৬.২৫% (১ জন) করে উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩৬ ঃ গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ইউ,পির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ভূমিকা	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬৪	১০০
না	-	-
মোট	৬৪	১০০

গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ইউ,পি গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে কিনা, উত্তরদাতাদের এই মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে ৩৬ নং সারণি ।

উত্তরদাতাদের সবাই অর্থাৎ ১০০% (৬৪ জন) মত প্রকাশ করেছেন যে, গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ইউ,পি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারণি-৩৭ ঃ গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা

ভূমিকাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সুষ্ঠু বিচার কাজে সহায়তা প্রদান করা এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটানো	৪	৬.২৫
বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন	১৪	২১.৮৭
অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাত করে	১	১.৫৬
অনেক ক্ষেত্রে থানা/আদালতের হয়রানি থেকে গরীব লোকদের রক্ষার জন্য গ্রামেই বিচার সালিশ করা হয়।	৭	১০.৯৩
গ্রাম পর্যায়ে মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব বিচার করে থাকে	১৭	২৬.৫৬
সাধারণ মানুষের সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মহলের বাধার সম্মুখীন হতে হয়	১	১.৫৬
সাধারণ মানুষ স্থানীয়ভাবে বিচার/সালিশের জন্য ইউ,পিতে আসে	২০	৩১.২৫
মোট	৬৪	১০০.০০

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ইউ,পি যেসব ভূমিকা পালন করে থাকে এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ৩৭ নং সারণিতে। যেখানে উত্তরদাতাদের একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩১.২৫% (২০ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ মানুষ স্থানীয়ভাবে বিচার/সালিশের জন্য ইউ,পিতে আসে এবং গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে এই ভূমিকাই প্রধান। গ্রাম পর্যায়ে মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব বিচার করে থাকেন এই মতামত ব্যক্ত করেছেন ২৬.৫৬% (১৭ জন) উত্তরদাতা।

২১.৮৭% (১৪ জন) অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইউ,পি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১০.৯৩% (৭ জন) উত্তরদাতা বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে থানা/আদালতের হয়রানি থেকে গরীব লোকদের রক্ষার জন্য ইউ,পি গ্রামেই বিচার সালিশ করে থাকে।

সুষ্ঠু বিচার কাজে সহায়তা প্রদান করা এবং আইন শৃংখলার অবনতি না ঘটানো ইউ,পির গ্রামের বিচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা হিসেবে মতামত দিয়েছেন ৬.২৫% (৪ জন) উত্তরদাতা। অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাত করে এবং সাধারণ মানুষের সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মহলের বাধার সম্মুখীন হতে হয় এই দুটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন ১.৫৬% (১ জন) করে উত্তরদাতা।

সারণি-৩৮ ঃ পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে ইউ,পির ভূমিকা

ভূমিকা	সংখ্যা (n= ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৬	৭১.৮৭
না	১৮	২৮.১২
মোট	৬৪	১০০.০০

পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে ইউ,পি কোন ভূমিকা পালন করে কিনা সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হয়েছে ৩৮ নং সারণিতে।

৭১.৮৭% (৪৬ জন) উত্তরদাতা ইউ,পি ভূমিকা পালন করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে ২৮.১২% (১৮ জন) উত্তরদাতা মনে করেন পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে ইউ,পি কোন ভূমিকা পালন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩৯ ঃ পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে ইউ,পির উদ্যোগ

উদ্যোগসমূহ	সংখ্যা (n = ৪৬)	শতকরা হার (%)
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কর্মরত মাঠকর্মীদের সহায়তা করা	২৫	৫৪.৩৪
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা	১২	২৬.০৮
টিকা দিবস পালন করেন এবং এই বিষয়ে সাহায্য করেন	৫	১০.৮৬
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে (বিশেষ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ) সচেতনতা বাড়ায়	৬	১৩.০৪
প্রচার অভিযান করে	১	২.১৭

বিঃ দ্রঃ একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য।

পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে ইউ,পি যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে ৩৯ নং সারণিতে উত্তরদাতাদের সেই বিষয়ে মতামত দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতারা মতামত প্রকাশ করেছেন একের অধিক।

সারণি হতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা ইউ,পির ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কর্মরত মাঠকর্মীদের সহায়তা করাকে।

৫৪.৩৪% (২৫ জন) মনে করেন পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়টিই ইউ,পির প্রধান ভূমিকা। ২৬.০৮% (১২ জন) উত্তরদাতা ইউ,পির উদ্যোগ হিসেবে মতামত দিয়েছেন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাকে।

১৩.০৪% (৬ জন) উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে (বিশেষ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ) জনগণের সচেতনতা বাড়ানোকে। ১০.৮৬% (৫ জন) মত প্রকাশ করেছেন টিকা দিবস পালন করা এবং এ বিষয়ে সাহায্য করাকে। পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সচল করার ক্ষেত্রে ইউ,পির উদ্যোগ হিসেবে উত্তরদাতার ২.১৭% (১ জন) মতামত দিয়েছেন প্রচার অভিযান চালানোকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪০ ঃ স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

ভূমিকাসমূহ	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
ম্যানেজিং কমিটিতে উপদেষ্টা, সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে	২২	৩৪.৩৭
ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে	৩	৪.৬৮
ম্যানেজিং কমিটির সাথে সভায় মিলিত হওয়ার মাধ্যমে	২	৩.১২
স্কুলের পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে	৩	৪.৬৮
সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা	৩	৪.৬৮
স্কুলগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ একটা কমিটি গঠন করতে পারে	২	৩.১২
জানা নেই	২৭	৪২.১৮
লেখাপড়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা	১	১.৫৬
রাখার দরকার নেই	১	১.৫৬
মোট	৬৪	১০০

স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ৪০ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে ৪২.১৮% (২৭ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে তাদের কিছু জানা নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ৩৪.৩৭% (২২ জন) উত্তরদাতা ম্যানেজিং কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যদের উপদেষ্টা, সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকার কথা বলেছেন। ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, স্কুলের পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য রাখার মাধ্যমে এবং সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে ৪.৬৮% (৩ জন) করে উত্তরদাতা ইউপির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলে উল্লেখ করেন। ম্যানেজিং কমিটির সাথে সভায় মিলিত হওয়া এবং স্কুলগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটা কমিটি গঠন করা এই দুইটি বিষয় সম্পন্ন করা সম্ভব হলে ইউপি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মতামত দিয়েছেন ৩.১২% (২ জন) করে উত্তরদাতা।

লেখাপড়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন ১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা।

১.৫৬% (১ জন) উত্তরদাতা বলেছেন স্কুল পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা রাখার দরকার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪১ ঃ প্রজেক্ট কমিটির সদস্য

কার্যক্রম	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৩	২০.৩১
না	৫১	৭৯.৬৮
মোট	৬৪	১০০

আপনি কোন প্রজেক্ট কমিটির সদস্য কিনা উত্তরদাতাদের এই মতামত নিয়ে সাজানো হয়েছে ৪১ নং সারণি।

৭৯.৬৮% (৫১ জন) উত্তরদাতা মতামত দেন তারা কোন প্রজেক্ট কমিটির সদস্য নন। ২০.৩১% (১৩ জন) উত্তরদাতা নিজেকে প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

সারণি-৪২ ঃ প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব

দায়িত্ব	সংখ্যা (n = ৬৪)	শতকরা হার (%)
সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করে	৮	১২.৫
অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত) করে	১৫	২৩.৪৩
সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান	১৬	২৫.০০
আরএমসি-এর কাজ পরিদর্শন	২	৩.১২
প্রকল্পের কাজটি পরিচালনা করে	৮	১২.৫
জানা নেই	১৫	২৩.৪৩
মোট	৬৪	১০০

৪২ নং সারণিতে উত্তরদাতারা প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন। ২৫% (১৬ জন) মনে করেন সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করা প্রজেক্ট কমিটির প্রধান দায়িত্ব।

২৩.৪৩% (১৫ জন) উত্তরদাতার মতে অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত) প্রজেক্ট কমিটির কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩.৪৩% (১৫ জন) বলেছেন যে প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে তারা অবগত নন। ১২.৫% (৮ জন) বলেছেন প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা।

১২.৫% (৮ জন) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব প্রকল্পের কাজটি পরিচালনা করা। ৩.১২% (২ জন) অভিমত দিয়েছেন যে, প্রজেক্ট কমিটির দায়িত্ব আর.এম.সি-এর কাজ পরিদর্শন করা।

৬.৪ উপসংহার

এ অধ্যাক্তেতয় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত দায়িত্ব কর্তব্য ও এক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদকে অধ্যাদেশে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকলেও প্রকৃত পক্ষে পরিষদ সব দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এ গবেষণায় উত্তরদাতারা ইউনিয়ন পরিষদের ১৫টি কাজ চিহ্নিত করেছেন।

এ অধ্যায়ের উপাত্ত থেকে লক্ষ্য করা যায় ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী এলাকার পানীয় জল সরবরাহ, কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা সফল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী

৭.১ ভূমিকা

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনমানুষের সঙ্গে কতখানি জড়িয়ে আছে অর্থাৎ স্থানীয় জনমনে বিশেষ করে এলাকার দরিদ্র নারী পুরুষ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কি ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পান; কিংবা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ আদৌ কোনো ভূমিকা রাখে কিনা - এ বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করেছি।

সমীক্ষাধীন ৪টি ইউনিয়ন থেকেই গুণগত তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায়, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পরিমাণগত তথ্য অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ করেছি যাতে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলোও এসেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক কি - এ বিষয়টি জানার চেষ্টা করেছি। প্রকারান্তরে দরিদ্র নারী-পুরুষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কতখানি উপকার পাচ্ছে তা জানাই এই অধ্যায়ের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

তথ্যগুলো জানার জন্য 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন' কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে চারটি করে 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন' করা হয়। দু'টি দরিদ্র মহিলাদের সমন্বয়ে অন্য দু'টি দরিদ্র পুরুষ সমন্বয়ে। মোট ১৬টি 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন' করা হয়। ফোকাস গ্রুপগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে কতগুলো প্রশ্নের আলোকে যা আলোচনার গাইড লাইন হিসেবে পূর্বেই চয়ন করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. কোন কাজে ইউনিয়ন পরিষদে যান কি?

খ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের (মেম্বার) সাথে কোন যোগাযোগ আছে কি?

গ. যদি যোগাযোগ থাকে তাহলে কি কারণে যোগাযোগ রাখেন?

ঘ. আপনারা ভি,জি,ডি ও ভি,জি,এফ কার্ডের সদস্য (এই গ্রামে) কত জন?

ঙ. বিপদ-আপদে ইউনিয়ন পরিষদ আপনাদের কি ধরনের সহযোগিতা করে?

Dhaka University Institutional Repository

'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন' থেকে দরিদ্র জনগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যেকার সম্পর্কটি যেভাবে বেরিবে এসেছে তাতে সুস্পষ্ট হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিরাজমান।

৭.২ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ইউ,পি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণ

'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন'গুলো থেকে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে ইউনিয়নভুক্ত দরিদ্র নারী-পুরুষের যোগাযোগ অপরিহার্য। বহুমুখী সমস্যা ও সহযোগিতার জন্যই এ যোগাযোগ। গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় প্রধানত ৪টি কারণে দরিদ্র লোকজন ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ রাখেন। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. রিলিফ ও অর্থ সংক্রান্ত কারণে

খ. ঋণ, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য

গ. ভি,জি,এফ ও তি,জি,ডি কার্ডের জন্য

ঘ. বিচার সালিসের জন্য

ক. রিলিফ ও অর্থ সংক্রান্ত

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত বন্যা ও খরার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোকেরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন রিলিফ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাবর জন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে গম/চাল বিতরণ করা হয় গরীব মানুষের জন্য - এ বিষয়টি সবাই অবগত। তাই এমন পরিস্থিতিতে তারা যোগাযোগ করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, গরীব লোকজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের থেকে থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। তবে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাবও এসেছে গ্রুপগুলো থেকে।

খ. ঋণ, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তি

কৃষি ব্যাংক কিম্বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য চেয়ারম্যান মেম্বারদের সুপারিশ এর প্রয়োজন হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য গরীব লোকজন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ করে থাকেন এবং সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। কৃষি পেশার বাহিরে অনেক গরীব মানুষের অকৃষি পেশায় শ্রম দিচ্ছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় অকৃষি পেশায় শ্রম দেয়ার ক্ষেত্রে রিক্সা চালনা অন্যতম। যৌতুক পাওয়া টাকা ও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া টাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে রিক্সা কেনার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় ফোকাস গ্রুপ-এর আলোচনা থেকে। রিক্সা কেনার পর ইউনিয়ন পরিষদের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। তাই লাইসেন্স এর জন্য গরীব লোকজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ রাখেন বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই বলেও গ্রুপ আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চরিত্র সার্টিফিকেট দরকার হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় দরিদ্র পুরুষ-মহিলারা চরিত্র সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ করেন। ইদানিং বেশ কিছু মহিলা ঢাকায় গার্মেন্টস এর কাজের জন্য আসেন। এজন্য তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে চরিত্র সার্টিফিকেট দরকার হয় বলেও জানা যায়।

গ. ভি,জি,ডি ও ভি,জি,এফ কার্ড প্রাপ্তি

গবেষণার আওতাভুক্ত চারটি ইউনিয়নে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে ৩৫ জন করে ভি,জি,ডি কার্ড পেয়েছেন গরীব লোকজন। প্রতিটি কার্ড একটি পরিবারের জন্য ২ বছরের জন। ২ বছর পার হলে আবার অন্য দরিদ্র লোকজন কার্ড পান। আগের দরিদ্র লোকজন কার্ড আর পান না। প্রতি কার্ডে ৩০ কেজি গম পাবার কথা থাকলেও তা পান না, তারা ২/৩ কেজি কম পান। এতে দরিদ্র লোকজনের মধ্যে তেমন ক্ষোভ নেই। তবে ভিজিডি কার্ড দ্বিগুণ বাড়ানো হলে মোটামুটি চাহিদা পূরণ হয় বলে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায়।

ভি,জি,এফ সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায় বছরে গড়ে ৩ বার হত দরিদ্র লোকজন এই কার্ড পান। এটা মুলত মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদ এবং পুজার সময় পাওয়া যায়। তাছাড়া মঙ্গা বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পাওয়া যায়। প্রতিটি পরিবার ১০ কেজি করে চাল পাবার কথা থাকলেও পেয়ে থাকেন ৭.৫ কেজি করে। ভি,জি,এফ কার্ডের সংখ্যা প্রতিবার সমান থাকে না। ৪টি ইউনিয়নের ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে দেখা যায় ঈদুল ফিতর এর সময় গড়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ৫০০, ঈদুল আযহার সময় গড়ে ৪০০ এবং সেপ্টেম্বর মাসে (lean season) গড়ে ২০০ করে ভি,জি,এফ কার্ড পেয়েছেন দরিদ্র লোকজন। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের সহযোগিতা ভালোভাবে পাওয়া যায় বলে দরিদ্র নারী ও পুরুষের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায়। উল্লেখ্য ভি,জি,এফ এর চাল ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বিচার সালিশের জন্য যোগাযোগ

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় গরীব জনগোষ্ঠী বিচার সালিশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিচার সালিশে আনিত বিবাদগুলির কারণ অর্থাৎ কোন ধরনের বিবাদের কারণে গরীব লোকজন চেয়ারম্যান মেম্বারদের শরনাপন্ন হন তা ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় আসে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় সাধারণত ছয়টি কারণে বিচার সালিশের জন্য চেয়ারম্যান মেম্বারদের সংগে যোগাযোগ করা হয়। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জমি বা ভিটেবাড়ী সংক্রান্ত বিবাদ;

২. ছেলে মেয়ের বিবাহ ও যৌতুক সংক্রান্ত;

৩. প্রেম ঘটিত সমস্যা;

৪. বিবাহ বিচ্ছেদ;

৫. চুরি;

চ. তুচ্ছ ঘটনায় মারামারি।

গবেষণাভুক্ত চারটি ইউনিয়নের ১৬টি ফোকাস গ্রুপ থেকে জানা যায় গরীব লোকজন প্রতিটি বিচারের ক্ষেত্রে সালিশ বা বিচার চেয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের কাছে যান। চেয়ারম্যান বা মেম্বাররা এসব বিষয় মীমাংসার জন্য গ্রামের গণ্যমান্য লোকজন সমন্বয়ে সালিশ ডাকেন। প্রায় ৮০% ঝড়গা বিবাদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিচার পেয়ে থাকেন গরীব লোকজন। এ তথ্য জানা যায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে।

রিলিফ ও অর্থ সংক্রান্ত কারণে গরীব লোকজন ইউনিয়ন অফিস তথা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের সংগে যোগাযোগ রাখেন বলে জানা যায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন থেকে। রিলিফ দেয়া হয় সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন বন্যা, খরা, কারণ এলাকায় অভাব অভিযোগ দেখা দিলে সরকার ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে রিলিফ এর ব্যবস্থা করে। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে গরীব লোকজনের মধ্যে এসব রিলিফ বিতরণ করা হয়। রিলিফ সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে আসে না। তাই বিতরণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মেম্বাররা বাছাই করেন প্রকৃত গরীব লোকজনকে। চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে গরীব লোকজন রিলিফ পেতে পারেন - তাই যোগাযোগ রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ঘর তৈরি, পানীয়জল এর সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবার জন্য গরীব লোকজন চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে অর্থ পাবার জন্যও গরীব লোকজন যোগাযোগ করেন চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে।

চারটি ইউনিয়নের ১৬টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে গরীব লোকজন ইউনিয়ন পরিষদ তথা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

৭.৩ উপসংহার

এ অধ্যায়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্কের ধরন কি সেটা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ সম্পর্ক তাদের রাখতে হয় যেমন ভিজিডি ভিজিএফ কার্ড পাওয়ার জন্য তেমনিভাবে বিচার শালিসে সুবিচার পাওয়ার জন্যও সম্পর্ক রাখতে হয়। এগুলো ছাড়াও সার্টিফিকেট, রিক্সা লাইসেন্স ইত্যাদির জন্য সাধারণ মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ রাখে। তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সমীক্ষাভূক্ত চারটি ইউনিয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৮.১ ভূমিকা

এ সমীক্ষায় চারটি ইউনিয়ন পরিষদ চয়ন করা হয়েছে ইউনিয়নগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ সমীক্ষার ইউনিয়ন পরিষদগুলির মধ্যে আছে, কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ, নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের সাতারকুল এবং ভুমনী ইউনিয়ন পরিষদ। এই চারটি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং কাগজপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এই আলোচনা ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে চারটি ইউনিয়ন সম্পর্কে এই অধ্যায়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

৮.২ বিজয়পুর

কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়নটি একটি উন্নত ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভাল। জেলা সদরের সাথে এ ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের পাঁকা রাস্তার মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে। কুমিল্লাতে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে কুমিল্লা সদর উপজেলাকে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। বিজয়পুর ইউনিয়ন কুমিল্লা সদর উপজেলায় অবস্থিত হওয়ার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার হওয়ার কারণে কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ইউনিয়নটির উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান এ ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত। একটি উন্নত ইউনিয়ন হিসেবে বিজয়পুরকে এ সমীক্ষায় চয়ন করা হয়েছে।

বিজয়পুর আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে একটি বড় ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের বর্তমান আয়তন ১৯ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৫২ হাজার। বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বিষয়ে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান, সদস্যদের আলোচনা ও মতামত থেকে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রমের কতগুলি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এমপি সাহেবের প্রভাবের বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে এমপি সাহেবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। চেয়ারম্যান, সদস্যরা স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনাক করতে পারছে না। সকল বিষয়ে এমপি সাহেবের উপদেশ তাদের শুনতে হয়। বিশেষ করে প্রকল্প নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এমপি সাহেবের মতামত চূড়ান্ত। প্রকল্প কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও এমপি সাহেবের মতামত গ্রহণ করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার শালিসের ব্যাপারেও এমপি সাহেব নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এমপি সাহেবের সাথে চেয়ারম্যান, সদস্যরা সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহী থাকে। এমপি সাহেবের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে তারা নিজেদের এলাকায় কিছু কাজ করতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

বিজয়পুর ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ৫০টি। আগে এই ৫০ জনকে কিছুটা করে কম দিয়ে আরো বেশি লোককে ভিজিডি'র গম দেওয়া হত। কিন্তু গম পরিমাণে কম দেওয়া হলে বদনাম হয় সে কারণে বর্তমানে এই ইউনিয়নের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ৫০ জনকেই গম দেওয়া হয়ে থাকে।

ভিজিএফ'এর বরাদ্দ সাধারণত বছরে ২/৩ বার এসে থাকে। প্রত্যেকবার ৩০০ থেকে ৪০০ লোক এই বরাদ্দ পেয়ে থাকে।

এ বছর বিজয়পুর ইউনিয়নে ২ বার রিলিফ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বার ৩০০ থেকে ৪০০ লোককে গম অথবা চাল সাহায্য করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারি সাহায্য ছাড়াও নিজেদের উদ্যোগে সাহায্যের ব্যবস্থা করে থাকে।

৮.৩ দক্ষিণ বিশিউড়া

দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত একটি অনুন্নত ইউনিয়ন। দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ। ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে উপজেলা সদর বা জেলা সদরে আসতে হলে দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে আসতে হয়। এ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। এ ইউনিয়নে দিন মজুরের সংখ্যা অনেক এবং তাদের দৈনিক মজুরি দেশের অনেক অঞ্চল থেকে তুলনামূলকভাবে কম। এ অঞ্চলে দিন মজুরের মজুরি ৫০ টাকার বেশি নয়। দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নের আয়তন ৯ বর্গ মাইল

Dhaka University Institutional Repository

এবং জনসংখ্যা ১৬,৬৫৫ জন। দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

নেত্রকোনা সদরের সংসদ সদস্য একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। তিনি একজন বিরোধী দলের সংসদ সদস্য। বর্তমানে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভাল না। তিনি দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে বেশি হস্তক্ষেপ করেন না।

চেয়ারম্যান, সদস্যরা অভিযোগ করেন নেত্রকোনা সদরের সংসদ সদস্য বিরোধী দলের হওয়ার কারণে দক্ষিণ বিশিউড়াসহ সদরের সকল ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে। দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে কোন বিশেষ প্রকল্পের কাজ হয়নি।

দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ৩০টি। ভিজিএফ এর বরাদ্দ এ আর্থিক বছরে এ ইউনিয়নে ৩ বার পেয়েছে। প্রতিবার ৩০০ ব্যক্তিকে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যার সময় রিলিফ হিসেবে কিছু চাল বিতরণ করা হয়েছে।

৮.৪ সাতারকুল

সাতারকুল ইউনিয়ন পরিষদ ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের একটি ইউনিয়ন পরিষদ। তেজগাঁওই বাংলাদেশের একমাত্র সার্কেল। বাংলাদেশের অন্য জায়গায় সার্কেল বা থানা পরিষদের স্থানে উপজেলা কার্যকর রয়েছে এবং সার্কেল অফিসারের পরিবর্তে সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। সাতারকুল ইউনিয়নটি বর্তমান একজন মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্গত। সে কারণে মন্ত্রী মহোদয় সাতারকুলের উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহী।

সাতারকুল ইউনিয়নের আয়তন ১৮ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ২০ হাজার। সাতারকুল ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চেয়ারম্যান সদস্যদের অভিমত থেকে অনুধাবন করা যায়, চেয়ারম্যান, সদস্যরা নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারেন না। তাদের এমপি সাহেবের নির্দেশে কাজ করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এমপি সাহেব নির্বাচন করেন। এ ইউনিয়নে একটি খাল খনন করা খুব প্রয়োজন। কিন্তু এমপি সাহেবের সম্মতি না পাওয়ার কারণে কাজটি করা যায়নি। প্রকল্প কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রেও এমপি সাহেবের নির্দেশ মানতে হয়। তবে চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

ও সকল সদস্যদের মতে এলাকার এমপি একজন মন্ত্রী হওয়ার কারণে এলাকায় যথেষ্ট উন্নয়ন হচ্ছে এবং তিনি সৎ ও কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

সাতারকুল ইউনিয়নের উন্নয়নে মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ আগ্রহ নেওয়ার কারণে এ ইউনিয়নে প্রচুর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলির বেশির ভাগ হয়েছে ২০০২ সালের নির্বাচনের পর। ২০০২ সাল থেকে এ বছর পর্যন্ত ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০০২ সালের আগে দীর্ঘদিন মামলার জটিলতার কারণে সাতারকুল ইউনিয়নে নির্বাচন হয়নি। সে সময় বর্তমান চেয়ারম্যান একজন নেতা হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সে সময় ৫টি প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়।

সাতারকুল ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ৩০টি। ভিজিডি কার্ডধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৩০ কেজি করে গম দেওয়ার নিয়ম থাকলেও প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হয় ২২ কেজি বাকীটা অন্য গরীব ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্য গরীবরা প্রত্যেকে ৫ কেজি করে গম পেয়ে থাকে।

এ বছরের মধ্যে ৫ বার ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে। ৩ বার দেওয়া হয়েছে ৩০০ জনকে, ১ বার দেওয়া হয়েছে ৪০০ জনকে এবং আরেক বার দেওয়া হয়েছে ৫০০ জনকে। প্রত্যেক ব্যক্তি ১০ কেজি করে চাল পেয়েছে। এছাড়া রিলিফ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে শীত বস্ত্র, হাই প্রটিন বিস্কুট, খেজুর বিতরণ করেছেন। দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দুর্যোগ মোকাবেলার ব্যবহস্থা গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে আছে, বয়াতি গান, নৌকা বাইচ এবং ওয়াজ মাহফিল।

৮.৫ ভুমনী

ভুমনী তেজগাঁও সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ। ভুমনী ইউনিয়ন একটি নতুন ইউনিয়ন। আগে ভুমনী বেরাইদ ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল। ভুমনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বেশির ভাগ সদস্য প্রথম বার ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন। চেয়ারম্যান আগে চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

ভুমনী ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে চেয়ারম্যান, সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। তারা বলেন, ভুমনী একটি নতুন ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। এমপি সাহেবের উপদেশ, নির্দেশে তারা পরিষদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন। ইউনিয়নের সকল উন্নয়ন প্রকল্প এমপি সাহেবের নির্দেশে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এমপি সাহেব ইউনিয়নের উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকেন। এমপি সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ তদারক করেন।

এ ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ৩০টি। ৩০ জনকেই দেওয়া হয়। এদের পরিমাণ কমিয়ে অতিরিক্ত কার্ড দেওয়া হয় না।

এ বছর ডুমনী ইউনিয়নে ভিজিএফ এর চাল দু'বার বিতরণ করা হয়েছে। রোজার ঈদে ৫০০ জনকে এবং কোরবানী ঈদে ৪০০ জনকে চাল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রিলিফ হিসেবে শাড়ী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বন্যার সময় ২০০৩ সালে ৩ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

৮.৬ উপসংহার

এই অধ্যায়ে সমীক্ষার চারটি ইউনিয়ন পরিষদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভিন্ন বৈশিষ্টগুলির ভিত্তিতে আমরা চারটি ইউনিয়নের একটি তুলনামূলক চিত্র পাই। সমীক্ষা অনুসন্ধানে জানা যায় ঢাকা জেলার সাতারকুল ইউনিয়নে যথেষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাতারকুল এত উন্নয়ন প্রকল্প পাওয়ার অন্যতম কারণ এই এলাকার সংসদ সদস্য সরকারের একজন মন্ত্রী। অন্যদিকে দেখা যায় সবচেয়ে কম উন্নয়ন হচ্ছে নেত্রকোনা জেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে। ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সদস্যরা জানান নেত্রকোন সদরে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য থাকার জন্য এই এলাকা অবহেলিত হচ্ছে।

ইউনিয়নগুলির মধ্যে যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমনভাবে এগুলির মধ্যে কতগুলি মিল লক্ষ্য করা যায়। সমীক্ষার চারটি ইউনিয়নের মধ্যে তিনটি ইউনিয়নে পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যরা বলেন তাদের কাজের স্বাধীনতা নেই, মাননীয় সংসদ সদস্য সর্বদা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। কেবল একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সদস্যরা বলেন, এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য বিরোধী দলের এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে বেশি হস্তক্ষেপ করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

চারটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সদস্যরা সকলে মনে করেন, দরিদ্র মানুষকে আরো সাহায্য করার জন্য ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং আরো অধিক ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের ১০টি বাধ্যতামূলক কাজ এবং ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজ রয়েছে। এ সমস্ত কাজের অধিকাংশই পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত। কিন্তু পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অধ্যাদেশে বহু দায়িত্ব দেওয়া থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সীমিত কতগুলি দায়িত্ব পালন করছে। এ গবেষণায় দেখা যায় উত্তরদাতারা মত প্রকাশ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ ১৫টি কাজ সম্পাদন করে থাকে, ইউনিয়ন পরিষদের সম্পাদিত এই কাজগুলির মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রাধান্য পায়।

এ সমীক্ষার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যায় ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রকল্প আনার ক্ষেত্রে তদবীরের একটা ভূমিকা রয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামতের মধ্যে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রকল্প প্রাপ্তির ব্যাপারে মন্ত্রী, এমপি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের আনুকুল্য পাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। একটি স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জনগণের দাবী ও চাহিদাপূরণ করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। এ বাধাগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে সম্পদের সীমবদ্ধতা। ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জনগণ যে সেবা আশা করে তার বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ পূরণ করতে পারে না সম্পদের অভাবের জন্য। এছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব, জনগণের একাংশের অসহযোগীতাসহ বিভিন্ন বাধা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতিকে ধীর করে দেয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান যে ভূমিকা পালন করেন তার মধ্যে প্রধানত রয়েছে কাজের পরিকল্পনা করা, কাজের তত্ত্বাবধান করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা মূলত যে ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রয়েছে, পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ, কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চেয়ারম্যানকে কাজে সহযোগিতা করা এবং কমিটির সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের হাট-বাজার পল্লীর অর্থনীতির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ হাট-বাজারগুলিতে স্থানীয় কৃষি পণ্যের বেচাকেনা হয়। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তারা এই হাট বাজার থেকে সংগ্রহ করে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে এ সমস্ত হাট-বাজারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এ গবেষণায় দেখা যায় হাট-বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে কমিটি রয়েছে সে কমিটিগুলি এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করছে না। সে কারণে গ্রামের হাট-বাজারগুলির অবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খারাপ, দূর থেকে আসা মানুষ এ সমস্ত হাট বাজারগুলিতে অনেক সময় পানীয়জল বা টয়লেট পায় না, হাট-বাজারগুলি পরিস্কার থাকে না বা বহু জায়গায় হাটে জমে থাকে পানি। হাট-বাজার ব্যবস্থাপনার জন্যে যে কমিটি আছে সে কমিটি সক্রিয় থাকলে এ সমস্ত সমস্যা অনেক কমে যাবে। এসমস্ত কমিটিগুলির কাজ তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে আরো তৎপর করে তোলা হলে গ্রামের হাটবাজারগুলি সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হবে।

বাংলাদেশে সাধারণ দরিদ্র মানুষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে থাকে। তাদের জীবন ও জীবিকা অত্যন্ত কঠিন। গরীব মানুষদের পক্ষে এদেশের আইন ও প্রশাসনের সেবা পাওয়া অনেক সময় দুরুহ হয়ে উঠে। পল্লী অঞ্চলে গরীব মানুষের জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ একটি ভূমিকা পালন করে থাকে। এ গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় গরীব মানুষরা ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে যে সমস্ত সেবাগুলি পাচ্ছে তার মধ্যে আছে ভি.জি.ডি, ভি.জি.এফ কার্ড বিতরণ করা, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, দুর্যোগের সময় রিলিফ, বিচার শালিস এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি।

কিন্তু দেখা যায় সমপদের সীমাবদ্ধতা, পক্ষপাত, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের কারণে ইউনিয়ন পরিষদ গরীব সাধারণ মানুষদের যথেষ্ট সেবা দিতে পারে না। ইউনিয়ন পরিষদকে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত রেখে দরিদ্র মানুষের জন্যে সহায়তা কর্মসূচিগুলি বৃদ্ধি করলে গ্রামের দরিদ্র মানুষ প্রতিষ্ঠানটি থেকে অনেক বেশি সেবা পাবে। গ্রামীণ দরিদ্র্য দূর করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সহযোগীতা এবং ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ এলাকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

যেকোন দেশের উন্নতির জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়। নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়নকে সহায়তা করা এবং নারী নির্যাতন ও শিশু নির্যাতন নিরোধ করার ক্ষেত্রে বলিষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৩টি ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা এ আসনে নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের ১৯৯৭ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে এ আসনগুলিতে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এক পরিপত্রের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধি-বিধান জারী করা হয়েছে[১]। এ পরিপত্রে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরা যারা মূলত সংরক্ষিত আসনের সদস্য তারা ইউনিয়নের মহিলাদের অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে ভিজিডি কার্ড পেতে এবং বিধবা ভাতা পেতে সাহায্য, গরীব মহিলাদের গ্রাম আদালত/সালিশ পেতে সাহায্য, গরীব মহিলাদের হাসপাতালে যেতে সাহায্য, গরীব মহিলাদের দুর্যোগের সময় রিলিফ পেতে সাহায্য এবং গরীব মহিলাদের আইন আদালতের সাহায্য নিতে সহযোগিতা।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা/সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, এর মধ্যে আছে, সমাজের বাধা পারিবারিক বাধা এবং তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার অভাব। এ বাধা দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, মহিলা সদস্যদের প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করলে তারা ইউনিয়ন পরিষদে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কুমিল্লা মডেলে সমবায় ও ইউনিয়ন পরিষদের নিবিড় সম্পর্ক পল্লী উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় সমবায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। এ সমীক্ষার বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করে সমবায়ের সাথে (বিআরডিবি) ইউনিয়ন

[১] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র স্মারক নং প্রজেই-৩/বিবিধ-১৪/২০০১/৮০১ তারিখ ১০/৯/২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের কোন সম্পর্ক নেই। যারা সম্পর্ক আছে বলেছেন তাদের মতেও এ সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ ও সমবায়ের মধ্যে একটি কার্যকারী সম্পর্ক পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। পল্লী অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কর্ম সংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সমবায়ের ভূমিকা আছে তেমন উৎপাদনের এবং বাজারজাত করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'টি প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে একে অপরের পরিপূরণ হিসেবে কাজ করলে উভয়ে পল্লী উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কৃষি উৎপাদনের উপর মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সমীক্ষায় দেখা যায় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা খুব বেশি নয়। ইউনিয়ন পরিষদ সময়ে সময়ে উন্নত সার, বীজ সরবরাহ করে থাকে এবং কৃষকদের ঋণ পেতে সহায়তা করে। এছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে আর কোন উদ্যোগ নেই। পল্লীর তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ আরো অনেক সহায়তা করতে পারে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকরী করে তুললে পল্লীর মানুষের জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি, পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগ কর্মরত রয়েছে। কিন্তু এসব সরকারি বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের অভাব রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করলে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করতে হলে যেমন কয়েকটি ক্ষেত্রে তার ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সেবা কার্যক্রম বর্ধিত করা প্রয়োজন তেমনিভাবে এ প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের এবং কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দক্ষতা বৃদ্ধি না করা হলে অর্পিত দায়িত্ব তাদের পক্ষে সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সে কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, A.B. Sharifuddin (1983): *Bizna: A Study of Power-Structure in Contemporary Rural Bangladesh*, Bangladesh Book International, Dhaka, Bangladsh.

Alam, Muhammad Mustafa, Ahmed Shafiqul Huque, and Kirsten Westergaard (1994): *Development through Decentralization in Bangladesh: Evidence and Perspective*, Dhaka, UPL.

Ali, A.H.M. Shawkat ((1982): *Field Administration and Rural Development in Bangladesh, Dhaka: Centre for Social Studies*.

Ali, Qazi Azher (1978): *District Administration in Bangladesh, Dhaka: National Institute of Public Administration*.

Ali, Shaikh Maqsood *et al.* (1983): *Decentralization and People's Participation in Bangladesh, Dhaka: National Institute of Public Administration*.

Akhanda, Abdul Muttalib (1986): *Proceedings of International Symposium on BARD–A Personal Account and Seminar on Comilla Models of Rural Development A Quarter Century of Experience*, Kotbari, Comilla, BARD.

Barman, Dalem Ch. (1988): *Emerging Leadership Patterns in Rural Bangladesh*, Dhaka, Centre for Social Studies,

Chowdhury Anwarullah (1982): *Agrarian Social Relations and Rural Development in Bangladesh*, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co.

Choudhury, Lutful Huq, (1987): *Local Self Government and its Reorganization in Bangladesh*, Dhaka, NILG.

Das, Kshanada Mohan (1991): *Training and Commitment: Programmes for the Village Co-operators in Bangladesh*, Dhaka, NILG.

Faizulla, Mohammad (1987): *Development of Local Government in Bangladesh*, Dhaka: NILG.

Huq, Sayeedul (1999): 'Union Parishad: The Local Government in Bangladesh', New Delhi, *s Liberal Times, Vol.* VII, No. 4.

Hyder, Yusuf (1986): *Development the Upazila Way*, Dhaka: Dhaka Prakashan

Hye, Hasnat Adbul (1991): *Local Level Planning in Bangladesh, Dhaka: Local Government Institute*.

Karim, Md. Abdul (1991): *Upzaila System in Bangladesh: A Political and Administrative Analysis*, Dhaka, NILG.

Dhaka University Institutional Repository

Khan, Akhter Hameed (1983): *The Works of Akhter Hameed Khan Vol. I: Development of A Rural Community*, Kotbari, Comilla, BARD.

_____, (1983): *The Works of Akhter Hameed Khan Vol. II: Rural Development Approaches and The Comilla Model*, Kotbari, Comilla, BARD.

_____, (1983): *The Works of Akhter Hameed Khan Vol. III: Rural Works And The Comilla Cooperative*, Kotbari, Comilla, BARD.

Majumder, R.C (1943): *The History of Bengal*, Dhaka: University of Dhaka.

Quddus, Md. Abdul and K. Bhattacharje, Milan (ed.) (1996): *Poverty Focused Rural Development: A Hand-book on a Regional Training Programme, Kotbari, Comilla, BARD.*

Quddus, Md. Abul (ed.) (1996): *Rural Development in Bangladesh Strategies and Experiences, Kotbari, Comilla, BARD.*

Rahman, Atiur (1981): *Rural Power Structure: A Study of the Local Level Leaders in Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh Books International.

Rahman, Hossain Zillur and S. Aminul Islam, (2002): *Local Governance and Community Capacities: Search for New Frontiers*, Dhaka, UPL.

Seraj, Toufiq M. (1989): *The Role of Small Towns in Rural Development, Dhaka, NILG.*

Siddiqi, Kamal (1994): *Local Government in Bangladesh'*, Dhaka, UPL.

_____, (1991): *Fiscal Decentralization in Bangladesh*, Dhaka, NILG.

_____, (2000): *Jagatpur 1977-97: Poverty and Social Change in Rural Bangladesh*, Dhaka, UPL.

_____, (2000): *Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challenges*, Dhaka, UPL.

Sultan, K.M. Tipu (ed.) (1985): *Decentralization, Local Government and Resource Mobilization, Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development*, Comilla, BARD.

Tinker, Hugh (1954): *Foundation of Local self-government in India, Pakistan and Burman*, London, Atheton Press.

Westergaard, Kirsten and Abul Hossain (2000): Local Government in Bangladesh, *Sociologus*, Berlin, Duncker & Humblot.

আহমেদ তোফায়েল (২০০২): একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন : কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব, খুলনা, রূপান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাজেট ফরম

ফরম ক

সাতারকুল ইউনিয়ন পরিষদ

থানা/উপজেলা: তেজগাঁও সার্কেল, জিলা-- ঢাকা--- ২০০৩/২০০৪ বৎসরের জন্য।

প্রথম খন্ড চলিত হিসাব

আয়	আগামী বৎসরের বাজেট হিসাব ২০০৩/২০০৪	চলিত বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট হিসাব	পূর্বগত বৎসরের প্রকৃত আয়
১	২	৩	
১। স্থানীয় কর।			
২। ট্যাক্সসমূহ			
ক) জমি ও অট্টালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স	৮০০০০	পূর্বে বাজেটে ছিল না	পূর্বের হিসাব অস্থায়ী কার্যালয়ে নাই
খ) বাস্তভিটার উপর ট্যাক্স			
গ) স্থানীয় কোন এলাকায় ক্রয় ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত দ্রব্যাদির উপর ট্যাক্স			
ঘ) স্থানীয় কোন এলাকা হইতে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির উপর ট্যাক্স			
ঙ) পেশা, বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স			
চ) জন্ম, বিবাহ ও ভোজ অনুষ্ঠানের উপর ট্যাক্স			
ছ) সিনেমা, নাটক ও মঞ্চ অনুষ্ঠানের উপর এবং এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানেব উপর ট্যাক্স			
জ) পশুর উপর ট্যাক্স			
ঝ) গাড়ী ও বাইসাইকেলসহ সকল প্রকার যানবানন (মটর গাড়ী ব্যতীত) এবং সকল শ্রেণীর নৌকর উপর ট্যাক্স			
ঞ) বিশেষ কমিউনিটি ট্যাক্স			
১। ইঞ্জিন চালিত নৌকা	১০০০০		
২। ভ্যান গাড়ী	৩০০০০		
৩। রিক্সা লাইসেন্স	৩০০০০		
ঙ) কনজারভেন্সী			
চ) পানি সরববাহেব উদ্দেশ্যে পানি সববরাহ কেন্দ্র রাখার জন্য কর			
	১,৫০,০০০		

Dhaka University Institutional Repository

আয়	আগামী বৎসরের বাজেট হিসাব ২০০৩/২০০৪	চলিত বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট হিসাব	পূর্ববর্ত বৎসরের প্রকৃত আয়
১	২	৩	
ইজা	১৫০০০০	চলতি বাজেট নাই	অস্থায়ী কার্যালয়ে হিসাব নাই
৪। স্থানীয় ফি			
ক) ভবন নির্মাণ ও পুন:নির্মান কার্যের জন্য দরখাস্ত			
খ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন কার্যের প্রতিষ্ঠান হইতে লব্ধ সুবিধার জন্য ফি (কার্যের নাম)			
গ) মেলা, কৃষি শিল্প প্রদর্শনী টুর্নামেন্ট এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফি	৫০,০০০		
ঘ) বাণিজ্যের জন্য ফি			
ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বরাদ্দ পারমিটের জন্য ফি			
চ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কার্যের জন্য ফি			
ছ) পশু জবেহ ও মারার জন্য ফি			
জ) খোয়াড়	২,০০০		
ঝ) সরকারি মঞ্জুরী	৮০,০০০		
ঞ) বকেয়া ট্যাক্স	২০,০০০		
৫। সম্পত্তির খাজনা ও মুনাফা	২০,০০০		
৬। স্বেচ্ছামূলক দান			
৭। বরাদ্দ (বরাদ্দের উদ্দেশ্যে) সম্পর্কে বিবরণ			
৮। অর্থ বিনিয়োগের জন্য সুদ			
৯। বিবিধ			
মোট আয় চলতি হিসাব	৩,০২,০০০	নাই	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়	আগামী বৎসরের বাজেট হিসাব ২০০৩/২০০৪	চলিত বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট হিসাব	পূর্ববর্ত বৎসরের প্রকৃত আয়
১	২	৩	
১। সাধারণ এস্টাবলিশমেন্ট			
ক) চেয়ারম্যান ভাতা (ধার্য্য)	১৮,০০০		
খ) মেম্বার ভাতা (ধার্য্য)	১,০০,৮০০		
গ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা			
১। ভোটে গৃহীত			
২। ট্যাক্স আদায় এষ্টাবলিশমেন্ট (ভোটে সংগৃহীত)	১২,০০০		
৩। গ্রাম্য পুলিশ (বেতন ও উৎসব ভাতা)			
দফাদার	১৪,০০০		
মহলাদা	৫৮,৮০০		
৫। স্বাস্থ্য	২০,০০০		
৬। মিটিং বাবদ ব্যয়	২,৪০০		
৭। শিক্ষা প্রয়োজন হইলে পরিকল্পনার নাম	২৪,০০০		
৮। বিবিধ			
বাঁশের সাঁকো	৯,০০০		
অফিস খরচ	১০,০০০		
সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন	৫,০০০		
ভ্রমন ভাতা	২,০০০		
খাতা মেরামত	৫০,০০০		
মোট ব্যয় (চলিত হিসাব)	৩,০২,০০০		

Dhaka University Institutional Repository

ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদ

ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডুমনী, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

প্রস্তাবিত আয় খাতসমূহ

আয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
১। জমি দালানকোঠার বাৎসরিক মূল্যের উপর ও পরিবারের অবস্থা ব্যবহার উপর ধার্য্য উপর ধার্য্য কর	১,২৫,০০০
২। ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ আদায়	৪০,০০০
৩। গুদাম হইতে প্রাপ্ত	২০,০০০
৪। খোয়াড় হইতে প্রাপ্ত	২,৬০০
৫। ইঞ্জিন চালিত নৌকা হইতে প্রাপ্ত	২০,০০০
৬। রিক্সা ও ভ্যান গাড়ীর লাইসেন্স	২০,০০০
৭। সরকার মঞ্জুরী হইতে	৫৬,৪০০
৮। বকেয়া টাকা আদায়	২০,০০০
মোট	৩,০৪,০০০

Dhaka University Institutional Repository

ডুমনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডুমনী, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

প্রস্তাবিত ব্যয় খাতসমূহ

ব্যয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
১। চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা	১৮,০০০
২। সকল সদস্য	১,০০,৮০০
৩। আয়ের কমিশন ১৫% হারে	১৮,৭৫০
৪। অফিস খরচ	৫,০০০
৫। রাস্তাঘাট মেরামত	১,২০,০০০
৬। অফিস ভাড়া	৬,০০০
৭। সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৫,০০০
৮। ভ্রমন ভাতা	৩৪৫০
৯। মিটিং আপ্যায়ন	৫,০০০
১০। কাঠের সাঁকো মেরামত/তৈরি	৫,০০০
১১। অডিট	৪,০০০
১২। কৃষি খাবদ	৩,০০০
মোট	৩,০৪,০০০

Dhaka University Institutional Repository

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট

৮ নং দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ, থানা/উপজেলা নেত্রকোনা সদর, জেলা:নেত্রকোনা

আয়

প্রাপ্তির খাত	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০০৩-২০০৪ ইং	চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০০২-২০০৩ ইং	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০০১-২০০২
১	২	৩	৪
ক) নিজস্ব উৎস			
ইউনিয়ন কর বেট ও ফিস			
১। বাসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপব কর	১,০০০০০	১,০০০০০	৬৫,০৬০
২। ব্যবসা ও জীবিকার উপর কব (বকেয়া ট্যাক্স)	৪,৫০,০০০	৪,২০,০০০	
৩। অন্যান্য কর (খোয়াড় বাবদ)	৩,০০০	২,০০০	১,২০০
৪। হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি	৫০,০০০	১,০৫,০০০	১.৪৬.৭২০
৪। মটবযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনেব উপর লাইসেন্স ফি (রিক্সা বাবদ)	২,০০০	২,০০০	১,৩৬০
৫। সংস্থাপন			
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা	৫৬,৪০০	৫৬,৪০০	৪৭,০০০
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদেব বেতন ও ভাতাদি	১,০৭,৪৫০	১,০৫,৪৪০	১.১০,৪০০
৬। অন্যান্য			
(ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% টাকা	৫০,০০০	৫০,০০০	৩৫,৬০০
(খ) আগত	৪,০০০	-	৩২০.০৯
সর্বমোট	৮,২৫,৩৫০	৮,৪৩,৩৪০	৪.০৮,৬৬০.০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট

৮ নং দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ, থানা/উপজেলা নেত্রকোনা সদর, জেলা:নেত্রকোনা

ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০০৩-২০০৪ ইং	চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০০২-২০০৩ ইং	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০০১-২০০২
১	২	৩	৪
(ক) রাজস্ব			
১। সংস্থাপন ব্যয়			
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী	২,৬৯,৪০০	২,৩৩,২০০	৭৬,৪০০
(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৩,৩৩,৪০০	৩,০৯,১৬০	১,৩৮,৬৫১.৭৪
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়	৮২,৫০০	৭৮,০০০	৯,৭৫৯
(ঘ) আনুসংগিক (খেলাধুলা, আসবাপত্র, অফিস মেরামত)	১৮,০০০	৯,০০০	৪,০০০
(ঙ) স্টেশনারী	৫,০০০	৪,০০০	১,২৭৪.৮০
(চ) বিদ্যুৎ	৪,০০০	৫,০০০	১,৪৩৭
(খ) উন্নয়ন	৫০,০০০	১,০২,৫০০	৩৩,০০০
(ক) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত	২৫,১৫৫	২২,০০০	২৩,২৯৫
(খ) শিক্ষা	৩,০০০	৩,০০০	২,০০০
(গ) মিটিং বাবদ	৫,০০০	৩,০০০	১,৩৪০
(ঘ) হাট বাজার	-	৫২,৫০০	৫২,৫০০
(ঙ) চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা	৬,০০০	৬,০০০	-
(চ) নিরীক্ষা ব্যয়	২,৫০০	৩,০০০	-
(ছ) অন্যান্য (উদ্বৃত্ত)	২১,৩৯৫	১২,৯৮০	৬৫,৫০২.৫৫
সর্বমোট	৮,২৫,৩৫০	৮,৪৩,৩৪০	৪,০৮,৬৬০.০৯